কুরআন কি আল্লাহর বাণী নয়?

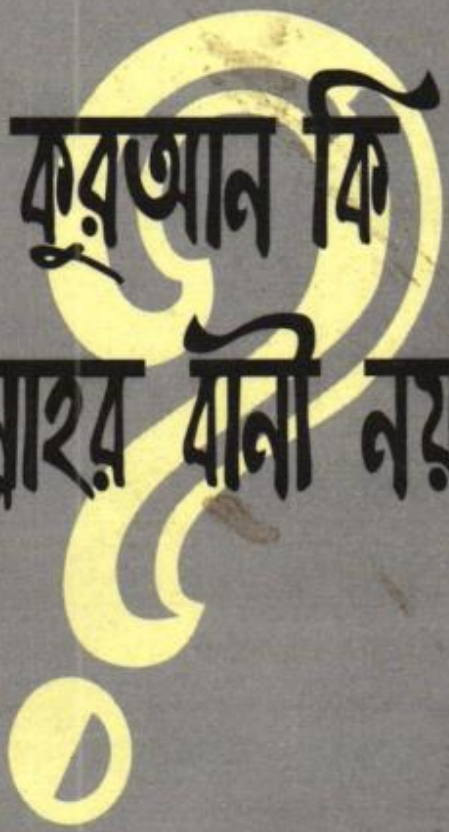

আতাউর রহমান সিকদার

কুরআন কি আল্লাহর বাণী নয় ?

(IS NOT THE QURAN GOD'S WORD ?)

আতাউর রহমান সিকদার

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

আঃ প্রঃ ২৯৪

সর্বস্বত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

১ম প্রকাশ

সফর	১৪২৩
বৈশাখ	১৪০৯
মে	২০০২

বিনিময় ঃ ৩০.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

QURAN KI ALLAHAR BANI NOY ? (Is not the Qur'an God's Word ?) by Ataur Rahman Sikder. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane , Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Taka 30.00 Only.

www.pathagar.com

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ভূমিকা

শয়তান মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য যত পন্থা অবলম্বন করেছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, সে আল্লাহর বাণী আল কুরআনুল কারীম সম্পর্কে মানুষের মনে নানাবিধ সন্দেহ, সংশয়ের সৃষ্টি করে দিয়েছে। কুরআন নাযিলের শুরু থেকে তার এ প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। যাদেরকে শয়তান পথভ্রষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে এবং হচ্ছে তারা আমাদেরই সমাজের মানুষ। তাদের সন্দেহ-সংশয়ের ধরণ অনেকটা এরূপ "কুরআন অতীতকালের কল্প-কাহিনী বৈ কিছু নয়।" "এটি একদল উগ্র ধর্মান্ধ লোকদের দ্বারা ঐশী কিতাব রূপে সংরক্ষিত হয়ে আসছে।" "কুরআন মুখস্থ করার এক উগ্র প্রথা মুসলমানদের মধ্যে যুগ যুগ ধরে বিরাজমান। এ কারণে এ গ্রন্থটি তাদের মধ্যে অবিকৃত অবস্থায় আছে কিন্তু আসলে এটি অতীত কাহিনী আর ভ্রান্ত বিশ্বাসের লালন ছাড়া আর কিছুই নয়।" উদাহরণ স্বরূপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডঃ আহমেদ শরীফের উক্তি উল্লেখ করা যায়। কুরআন সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন—"কাজেই এটা আজ মানুষের কল্পনাজাত বানানো গল্প। তেমনি আবাবিলের ঠোঁটচ্যুত কাঁকর কণার আঘাতে আবরাহা বাহিনীর বিনাশ। অজ্ঞ লীলাবাদী মানুষের বিশ্বাসযোগ্য অদ্ভূত বানানো গল্পমাত্র। একালে এসব অচল ও অবিশ্বাস্য হওয়ারই কথা।" (১৯৯২ সালের ২৩ মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কবি মতিউর রহমান খান স্মারক অনুষ্ঠানে ডঃ আহমদ শরীফের বক্তৃতা। ৮৪ পৃষ্ঠায় লিখিত তার এ বক্তৃতাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তিন খণ্ডে প্রকাশ করেছে)।

কিংবা যেমন ডঃ হুমায়ুন আজাদ লিখেছেন, তার "আমার অবিশ্বাস" গ্রন্থে "বহু ধর্মে রয়েছে শেষ বিচার নামে এক ভয়ংকর ব্যবস্থা যার ভয়ে অনুসারীরা থাকে দুঃস্বপ্নে। নরক বিধাতার বন্দী শিবির। বলা হয় ওই দিন সিংগা বেজে উঠবে, টুকরো টুকরো হয়ে যাবে স্বর্গতম্য, পাহাড়-পর্বত ধূলোতে পরিণত হবে, আকাশ হবে অন্ধকারাচ্ছন্ন, বলক দিতে থাকবে সমুদ্র রাশি। আর কবর থেকে বিচারের জন্য বেরিয়ে আসবে সমস্ত মানুষ। দাঁড়িপাল্লা দিয়ে মাপা হবে তাদের পাপ পুণ্য এবং বিচার করবেন বিধাতা। কারো জন্য নির্ধারিত হবে চির স্বর্গ, কারো জন্য চিরনরক। পরলোক হাস্যকর কল্পনা। মানুষ মরণে ভয় পায় বলেই উদ্ভাবন করেছে পরলোক স্বর্গ নরক। পরলোক হচ্ছে জীবনের বিরুদ্ধে এক অশ্লীল কুৎসা, পরলোকের কথা বলা হচ্ছে জীবনকে অপমান করা। পরলোকে বিশ্বাস জীবনকে করে তোলে নিরর্থক।" (বই "আমার অবিশ্বাস" পৃঃ ১০২-

www.pathagar.com

১০৩। লেখক ডঃ হুমায়ুন আজাদ) শুনতে অবাক লাগলেও অতীব সত্য কথা হচ্ছে এই উপরোক্ত এসব লেখকবৃন্দের অনুসারীর সংখ্যা খোদ ঢাকা শহরেই সহস্রাধিক।

আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা তাদের ঐসব ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনের উদ্দেশ্যেই। আমি আমার বক্তব্যকে উপস্থাপন করেছি প্রশ্ন ও উত্তর আকারে। যেমন "কুরআন কি মুহাম্মদ (সা) নিজে লিখেছেন ? বা অন্য কাউকে দিয়ে লিখিয়েছেন ? অথবা এ গ্রন্থ কি সুদুর অতীতে একদল কাহিনীকার দিয়ে তৈরি হয়েছে ? কিংবা এমন কি হয়েছে যে, এটি আল্লাহর বাণী বটে তবে মানুষ এটিকে হুবহু ঐরকম সন্নিবেশ করতে পারেনি। লিখতে গিয়ে উলট-পালট লিখে ফেলেছে ? অথবা এমন কি হয়েছে যে, এ কুরআন রচিত হয়েছে প্রাচীনকালের আরবীয় প্রতিভাধর কাব্যিক, সাহিত্যিকদের দ্বারা ?"

ইত্যকার নানাবিধ প্রশ্ন উথাপন ও এসবের উত্তর দানের মাধ্যমে আমি আমার আলোচনাকে গ্রন্থের রূপদানের চেষ্টা করেছি। আমার জ্ঞানের তুলনায় এটি অবশ্যই এক দুঃসাহসী পদক্ষেপ। কিন্তু তথাপিও যে জিনিসটিকে আমি দিবালোকের মত স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি তা পথহারা মানুষকে বলার অদম্য ইচ্ছা আমি চেপে রাখতে পারিনি। আমার ক্ষুদ্র গবেষণায় আমি দেখেছি এ পৃথিবীর বুকে যদি অতি আশ্চর্য কোনো জিনিস থেকে থাকে তাহলে তা হচ্ছে এ কুরআন কারীম।

মানুষ ভুল-ত্রুটির উর্ধে নয়। সে কারণে আমার এ বইয়েও ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। সুতরাং যদি কোনো ভুল কারোর নজরে পড়ে (মুদ্রণ, যুক্তি বা কুরআন, হাদীসের দলিল বিষয়ক যা-ই হোক না কেন) তা সরাসরি আমাকে লিখে জানালে আমি কৃতজ্ঞচিত্তে তা সংশোধন করবো।

আমার সৎ নিয়ত আর শ্রমকে আল্লাহ কবুল করুন এবং এটিকে আমার পরকালীন মুক্তির অসিলা স্বরূপ করে দিন। আমীন।

আতাউর রহমান সিকদার
১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৯৮
জেদ্দা, সৌদী আরাবীয়া
Email-ATAAL RAHMN @ YAHOO. COM

www.pathagar.com

সূচীপত্র

১. কেন আল্লাহ্ ঐশী কিতাব পাঠান ৭
২. কুরআনের পূর্বে প্রেরিত ঐশী কিতাবগুলো আজ কোথায় ১০
০ কুরআনে বৈজ্ঞানিক তথ্য ঃ এক ১২
০ ,, ,, ,, ঃ দুই ১৩
০ ,, ,, ,, ঃ তিন ১৭
০ ,, .. ,, ঃ চার ১৮
০ ,, ,, ,, ঃ পাঁচ ১৯
০ ,, ,, ,, ঃ ছয় ২১
০ ,, ,, ,, ঃ সাত ২২
০ ,, ,, ,, ঃ আট ২৩
৩. কুরআনে 'উনিশ' সংখ্যার বিস্ময়কর মিল ৩০
৪. সূরা তাওবার শুরুতে বিসমিল্লাহ্ নেই কেন ? ৩৬
০ কুরআন কিভাবে সংকলিত হয় ৩৮
৫. জনৈক ইয়াহুদী পণ্ডিতের একটি ঘটনা ৪৩
৬. কুরআনের ভাষালংকার ৪৬
৭. কুরআনের সত্যতায় জিন জাতি ৪৯
৮. কেমন ছিলেন এ কুরআনের বাহক ৫৩
০ নবী মুহাম্মদ (স)-এর ক্ষমশীলতা তায়েফের প্রান্তরে ৫৯
০ নবী মুহাম্মদ (স)-এর উদারতা মক্কা বিজয়ের প্রক্কালে ৬২
০ মুহাম্মদ (স)-এর দারিদ্রসুলভ জীবন যাত্রা ৬৪
০ আদর্শ বিচারক ৬৫
০ অধীনস্ত ও শ্রমিকের অধিকার আদায়ে নবী মুহাম্মদ (স) ৬৬
০ নিঃস্ব নিপীড়িতদের প্রতি মুহাম্মদ (স) ৬৭
০ ইয়াতীমদের প্রতি আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (স) ৬৭
০ মানবতার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ৬৮
০ দয়া ও করুণা অবলম্বন এবং কঠোরতা পরিহার ৬৯
০ মুহাম্মদ (স)-এর বিনয় ও নম্রতা ৭০

www.pathagar.com

০ সেনাপতি মুহাম্মদ (স) ৭১
০ আল্লাহর পথে আহ্বানকারী ৭৩
০ আল্লাহর স্মরণ ৭৪
০ নবী মুহাম্মদ (স)-এর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ৭৫
০ শেষ কথা ৭৮

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কেন আল্লাহ্ ঐশী কিতাব পাঠান

শয়তান যখন প্রথম মানব আদম ও মানবী হাওয়া আলাইহিমাস সালামকে পথভ্রষ্ট করলো আল্লাহর পক্ষ থেকে তখন এই ঘোষণা জারি হলো যে—

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ج فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○(البقرة : ٣٨)

"আমি বললাম, তোমরা সকলেই নেমে যাও, অতপর তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে হেদায়াত তথা পথনির্দেশ পৌছবে, যারাই এ পথনির্দেশ অনুসরণ করে চলবে তাদের কোনো ভয়ের কারণ নেই না তারা কোনোরূপ দুঃখ বা অনুশোচনায় পতিত হবে।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ৩৮)

আরও বলা হলো ঃ

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ ق وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ○ وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا س وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○ فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ س وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ج وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ○ (البقرة : ٣٤ ـ ٣٦)

"যখন আমি মালাইকাদের (ফেরেশতাদের) নির্দেশ দিলাম তোমরা আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলিশ ছাড়া সকলেই সিজদা করলো। সে আমার নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করলো এবং অহংকার প্রদর্শন করলো, অতপর কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। আমি আদমকে বললাম, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করতে থাক এবং যেখানে যা চাও পরিতৃপ্তি সহকারে খাও কিন্তু এ গাছটির নিকটবর্তী হয়ো না, যদি হও তাহলে তোমরা অবাধ্য যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে। অতপর একদিন শয়তান তাদের উভয়ের পদস্খলন ঘটালো এবং জান্নাতে বসবাসের অনুপযোগী করে ছাড়লো। আমি বললাম—তোমরা একে অপরের শত্রু

www.pathagar.com

হয়ে (অর্থাৎ মানুষ এবং শয়তান) এখান থেকে নেমে যাও এবং পৃথিবীতে তোমাদেরকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবস্থান করতে হবে।"

–(সূরা আল বাকারা ঃ ৩৪-৩৬)

কুরআন আরও বর্ণনা করছে ঃ

قَالَ اَنْظِرْنِىْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ○ قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ○ قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ○ ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ط وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ ○ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا ط لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ ○

"সে (শয়তান) বললো—আমাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। আল্লাহ বললেন, তোকে অবকাশ দেয়া হলো। শয়তান বললো—আপনি আমাকে যেমন উদ্‌ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করলেন আমিও অবশ্যই তাদের (মানুষদের) জন্য আপনার সরল পথে বসে থাকবো। অতপর তাদের কাছে আসবো তাদের সামনের দিক থেকে, পেছন দিক থেকে, ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে এবং আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না। আল্লাহ বললেন—বের হয়ে যা এখান থেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায়। তাদের (মানুষদের) যে কেউ তোর পথে চলবে, নিশ্চয়ই আমি তোদের সকলের দ্বারা জাহান্নামকে পূর্ণ করে দিব।"

–(সূরা আল আরাফ ঃ ১৪-১৮)

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এ পৃথিবীতে মানুষের পাশাপাশি আরও এমন একটি সত্তার অস্তিত্ব বিরাজমান যে মানুষের মঙ্গল চায় না। বরং অমঙ্গল ও অনিষ্ট সাধনে সদা তৎপর। সে সত্তাকে আমরা দেখি না কারণ এমন একটা উপাদান দিয়ে সে তৈরী যা চর্ম চক্ষু দেখতে সক্ষম নয়। কিন্তু সে মানুষকে দেখে এবং মানুষের চিন্তাশক্তিতে প্রভাব বিস্তার করার জন্য একটা অদৃশ্য শক্তি আল্লাহ তাকে দান করেছেন (কুরআন যেটাকে অসওয়াসা বলে উল্লেখ করেছে)। সেই শক্তি বলে সে মানুষকে পাপাচারে নিয়োজিত করতে সদা সচেষ্ট রয়েছে।

শয়তানের এ প্রচেষ্টা থেকে বাঁচার জন্যই এবং আল্লাহর পথ ও শয়তানের পথ এ দু'টোর মধ্যে পার্থক্য করার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ ঐশী কিতাবসমূহ

www.pathagar.com

পাঠিয়েছেন এবং সেসব কিতাবের বিধানাবলীকে বাস্তবে অনুসরণ করে দেখিয়ে দেয়ার জন্য সাথে নবী-রাসূলও পাঠিয়েছেন।

সুতরাং কেন আল্লাহ ঐশী কিতাব পাঠান তা আমাদের নিকট পরিষ্কার। এখানে আরও যে বিষয়টি দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠছে তা হচ্ছে এই যে, এ ঐশী কিতাবকে প্রত্যাখ্যান করা অর্থাৎ এর বিধানাবলীকে মানতে অস্বীকার করা মানেই হচ্ছে শয়তানের অনুসরণ করা। অতএব আমরা মানতে বাধ্য যে, এসব কিতাবকে আল্লাহ মানুষের পথ চলার GUIDENCE হিসেবে পাঠিয়েছেন, শুধুমাত্র সুমধুর স্বরে তিলাওয়াত করার জন্য নয়। তাবিজ-কবজ বানানোর জন্যও এসব কিতাব পাঠানো হয়নি। যেমনটা এক শ্রেণীর লোক মনে করে। যেমন, এক লোক নাকি তার সদ্য বিবাহিতা কন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠানোর সময় গিলাফে ভরে কুরআন শরীফ দিয়ে দিচ্ছিল। মেয়ে কুরআন পড়তে পারে কিনা জিজ্ঞেস করা হলে পিতা উত্তর দিচ্ছিল "পড়তে অবশ্য পারে না, তথাপি দিয়ে দিলাম জিন, ভূত যাতে না আসে।"

www.pathagar.com

কুরআনের পূর্বে প্রেরিত ঐশী কিতাবগুলো আজ কোথায়

আল কুরআনুল কারিম আমাদেরকে অবহিত করে যে, অতীতের জাতিগুলোর নিকট (এ ধরার বুকে প্রেরিত প্রথম নবী ও রাসূল থেকে শুরু করে শেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পূর্ব পর্যন্ত) যত আসমানী কিতাব আল্লাহ নাযিল করেছেন তার কোনোটিই আজ অবিকৃত অবস্থায় নেই। অধিকাংশ আসমানী কিতাবের অস্তিত্বই আজ একেবারে বিলীন। যে দু' একটি কিতাব বর্তমানে পৃথিবীতে আছে সেসবের সীমাহীন স্ববিরোধিতা, একই কিতাবের হরেক রকমের কপি ও বক্তব্য, আজগুবী কাহিনী ইত্যাদিই প্রমাণ করে যে এসব আল্লাহর বাণী নয়। এসব আসমানী কিতাবসমূহের সীমাহীন বিকৃতি সম্পর্কে কুরআন বলে দিচ্ছে ঃ

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ق ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلاً ط فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ○

"ধ্বংস তাদের জন্য, যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে আর বলে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। অর্থ উপার্জনের মানসেই এটা তারা করে। অথচ এ উপার্জন খুবই সামান্য। ধ্বংস হোক যা তারা নিজ হাতে লিখেছে, ধ্বংস হোক যা তারা উপার্জন করেছে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ৭৯)

وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَّلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ ج وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ج وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○(ال عمران : ٧٨)

"তাদের মধ্যে কিছু লোক এমন আছে যারা কিতাব পাঠ করার সময় জিহ্বাকে এমনভাবে উলট পালট করে যে, তোমরা যেন মনে কর যে, তারা মূল কিতাব থেকেই পাঠ করছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে তা আল্লাহর কিতাব নয়। তারা বলে এসব কথা আল্লাহর তরফ থেকে আগত। অথচ প্রকৃতপক্ষে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত নয়। তারা জেনে শুনেই মিথ্যা কথা আল্লাহর প্রতি আরোপ করছে।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৭৮)

যা হোক, অতীত ধর্মগ্রন্থগুলোর বিকৃতি সম্পর্কে যদি কেউ প্রামাণ্য দলিল চান তাহলে তাদেরকে আমি শাইখ আবদুল হাই রচিত, মদীনা পাবলিকেশন্স ঢাকা থেকে প্রকাশিত "সত্যের সন্ধানে" বইটি পড়ার অনুরোধ করছি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ (এক) কুরআন কি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিজের লিখা ?

উত্তর ঃ না। কারণ তিনি লিখতে পড়তে জানতেন না। তার শত্রুরাও স্বাক্ষ্য দেয় যে, তিনি ছিলেন নিরক্ষর (উম্মি)। মানব চরিত্রের স্বাভাবিক রীতি হচ্ছে এই যে, যদি তার দ্বারা কোনো সৃষ্টিকর্ম সম্পাদিত হয় সেটা সাহিত্য বিষয়ক বা বিজ্ঞান কিংবা অন্য যে কোনো পর্যায়েরই হোক না কেন তাহলে তা জনসমক্ষে, সাধারণ্যে প্রকাশ করার জন্য এক প্রবল বাসনা মনে লালন করতে থাকে। সে চাইতে থাকে যে, লোকে তাকে কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী বা আবিষ্কারক ইত্যাদি বলুক। এমন লোক খুঁজে পাওয়া যায় না যে কিনা নিজের নিরক্ষরতা নিজেই জাহির করে। কিন্তু কুরআনে আমরা দেখি যে রাসূল (স) নিজের নিরক্ষরতার কথা নিজেই প্রকাশ করছেন (দ্রষ্টব্য–সূরা আল জুম'আ ঃ ২, সূরা আল আনকাবুত ঃ ৪৮)।

যদি বলা হয়, তিনি কুরআন নিজে লিখে কোনো স্বার্থের জন্য এটাকে আল্লাহর প্রেরিত বলে চালিয়েছেন তাহলে প্রশ্ন আসে সেটা কোন্ স্বার্থ ? অধিক ধন উপার্জন ? কিন্তু আমরা তো দেখি কুরআন নাযিল শুরু এবং নবুয়তে অভিষিক্ত হবার পর থেকে তিনি খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার ধন-সম্পদ অকাতরে আল্লাহর পথে বিলি করা শুরু করলেন এবং একদিন কপর্দকশূন্য হয়ে গেলেন অথচ তিনি যখন খাদিজা (রা)-কে বিয়ে করেন তখন খাদিজা (রা) মক্কার শ্রেষ্ঠ ধনীদের একজন ছিলেন।

তাহলে কি কোনো সুন্দরী নারীকে বিবাহের ইচ্ছা ? তাও তো ইতিহাস থেকে প্রমাণ হয় না। বরং দেখা যায় ২৫ বছর বয়সের যুবক অবস্থায় তিনি ৪০ বছর বয়সের বিধবা মহিলাকে [খাদিজা (রা)] বিয়ে করেছেন। অতপর দীর্ঘ ১৩/১৪ বছর পর্যন্ত তিনি কোনো বিয়েই করেননি। যখন আবার বিয়ে করলেন তখন তিনি পৌঢ় আর যাদেরকে বিয়ে করলেন তারাও বিধবা (মাত্র একজন ছাড়া) আর তাদের প্রায় সকলেই পঁয়ত্রিশোর্ধে।

তাহলে কি যশলাভ, খ্যাতি অর্জনের ইচ্ছা ? কিন্তু সারা দুনিয়ার ইতিহাস তো এর বিপরীত কথা বলে। কাফির সরদার উতবা বিন রাবিই রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলছে—"ওহে ভ্রাতুষ্পুত্র, যদি তুমি ধন-সম্পদ চাও, বলো, তোমার পায়ের কাছে এনে আমরা তা জমা করি যাতে তুমি আমাদের সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ধনী হও। আর যদি তুমি যশ চাও, বলো, আমরা তোমাকে আমাদের নেতা বানিয়ে দেই। অতপর তোমার কর্তৃত্ব ছাড়া আর কারোর

www.pathagar.com

কথাই আমরা মানবো না। আর যদি তুমি রাজ্য চাও, বলো, আমরা তোমাকে এ ভূখণ্ডের রাজাধিরাজ বানাই, অথবা যদি তুমি মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে থাক, বলো আমরা তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করি। তথাপি এ নতুন দীনের কথা বলা তুমি বন্ধ কর"।

কিন্তু তিনি এসবের কোনো একটি কি গ্রহণ করেছিলেন ? না বরং আমরা দেখি তিনি অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট, নিপীড়ন এবং নির্বাসন পর্যন্ত গ্রহণ করলেন তথাপিও কুরআন যে আল্লাহর বাণী, তিনি যে নবী একথা বলা থেকে বিরত হলেন না। তায়েফের প্রান্তরে কাফিররা রাসূল (স)-কে পাথর মেরে রক্তাক্ত করছে আর তিনি হাত তুলে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করছেন—"হে আল্লাহ! তারা তো অজ্ঞ তাদেরকে তুমি ক্ষমা কর।" কোনো স্বার্থবাদী লোকের চরিত্র কি এমন উদার হতে পারে ? আছে কি জগত জুড়ে এমন দৃষ্টান্ত ?

তাহলে এটা কি আমরা মানতে বাধ্য নই যে, কোনো স্বার্থের জন্যও তিনি কুরআন নিজে লিখে আল্লাহর বলে চালাতে চেষ্টিত হননি।

এবারে আসুন কুরআনে বর্ণিত বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্বাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। এ আলোচনায় প্রমাণিত হবে কুরআন মুহাম্মদ (স)-এর নিজের রচনা নয়। না অন্য কাউকে দিয়ে তিনি এটি লিখিয়েছেন। না অন্য কোনো মানব মস্তিষ্ক এর স্রষ্টা। কারণ কুরআনে এমন কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলী আমরা পাই যা তৎকালীন দুনিয়ায় মানুষ চিন্তাও করেনি। তখনকার যুগের মানুষের পক্ষে এসব অবগত হওয়া সম্ভবও ছিল না। যা আবিষ্কার করলো উন্নত প্রযুক্তি যুগের মানুষেরা এই মাত্র বছর কয়েক আগে।

কুরআনে বৈজ্ঞানিক তথ্য ঃ এক

আমরা জানি, এ বিশ্ব সৃষ্টির মৌলিক ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিজ্ঞানীগণ অতি সম্প্রতি একটি তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন। যেটিকে ইংলিশে বলা হয় "বিগ ব্যাং থিয়োরী।" এ তত্ত্ব অনুসারে বিজ্ঞানীগণ বলেন যে, "এ বিশ্ব এক সময় একক অবস্থায় ছিল অতপর হঠাৎ তা বিদীর্ণ হয় এবং এভাবেই এ পৃথিবী ও সৌরমণ্ডলের অন্যান্য যাবতীয় গ্রহ-নক্ষত্রের সৃষ্টি।

অথচ কুরআন কারিমে এ তত্ত্ব পরিবেশিত হয়েছে আজ থেকে চৌদ্দশত বছর আগে। এমন এক সময় যখন আরবরা উট, দুম্বা চরাতো মরু প্রান্তরে, যাতায়াতের জন্য নির্ভরশীল ছিল উট কিংবা ঘোড়ার উপর ; আর রোম, ইরান জাহাজে পাল তুলে বসে থাকতো অনুকূল বাতাসের অপেক্ষায়।

www.pathagar.com

কুরআনে সূরা আল আম্বিয়ায় ৩০নং আয়াতে আল্লাহ এ তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন এভাবে—

اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ط وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ط اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ○(الانبياء : ٣٠)

"অবিশ্বাসীরা কি দেখে না—এ আকাশ মণ্ডল আর যমীন এ সবইতো একত্রে মিলিত অবস্থায় ছিল, অতপর আমিই তো সেটিকে বিচ্ছিন্ন করলাম। আর প্রাণবন্ত সবকিছুকে আমি পানি থেকে সৃষ্টি করেছি তবুও কি তারা ঈমান আনবে না।"–(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৩০)

এ বিশ্ব যে, এক সময় একক অবস্থায় ছিল এ তথ্য কি করে জানলেন নিরক্ষর মুহাম্মদ (সা) ? অথচ সে যুগে বিজ্ঞান চর্চার অস্তিত্ব কোথাও ছিল না। এ থেকে কি প্রমাণিত হয় না যে, কুরআন কোনো মানুষের সৃষ্টি নয় বরং তা এসেছে এমন এক সত্ত্বার নিকট থেকে যিনি এ বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন।

কুরআনে বৈজ্ঞানিক তথ্য ঃ দুই

বিজ্ঞানের অগ্রগতি সাধনের পূর্বে মানব প্রজনন সম্পর্কে এমন সব আজগুবী কাহিনী আর উপকথা মানুষের মাঝে প্রচলিত ছিল, যা পড়লে হাসি রাখা দায়। অবশ্য এটি অস্বাভাবিক কিছু নয়। কারণ আগেকার দিনের মানুষ মাতৃগর্ভের ছবি তুলতে পারতো না, তারা জানতো না কিভাবে, কতদিন পর এবং কোথায় মানব বীর্য ভ্রূণে পরিণত হচ্ছে। এসব জানতে হলে প্রয়োজন এনাটমি জ্ঞানের, অপরদিকে থাকতে হবে অত্যাধুনিক X-RAY মেশিন।

অথচ অবাক ব্যাপার, চৌদ্দশত বছর পূর্বে সে যুগেই এ তথ্য পরিবেশন করেছেন নিরক্ষর মুহাম্মদ (সা)। একদিকে কুরআন এবং অপরদিকে তার হাদীসসমূহে এসব বর্ণিত হয়েছে যা কিনা আজ আমরা কম্পিউটার বা টিভির পর্দায় দেখছি। যেমন কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۝ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۝ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ق ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ط فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ ○ (المؤمنون : ١٢-١٤)

www.pathagar.com

"আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি, অতপর শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তে পরিণত করেছি, অতপর জমাট রক্তকে গোশতপিণ্ডে পরিণত করেছি, অতপর সে গোশতপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, এরপর অস্থিকে গোশত দ্বারা আবৃত্ত করেছি অবশেষে তাকে এক নতুনরূপে দাঁড় করিয়েছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়।"–(সূরা মুমিনূন ঃ ১২-১৪)

আরও দ্রষ্টব্য ঃ সূরা আল হাজ্জ ৫, সূরা আল আলাক ১-২ এবং বুখারী ২৯৬৭, মুসলিম ২৯৯৬, তিরমিযি ৭৮, নাসায়ী ১৬৫, আবু দাউদ ১৫৫।– (হাদীস সফ্‌টওয়ার সিডি)।

মানব প্রজনন সম্পর্কে কুরআনের এ বর্ণনার সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব মিল দেখে কত হাজারো অমুসলিম বিজ্ঞানীর চিন্তাজগতে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে তার ইয়ত্তা নেই। তাদেরই একজন ডঃ মরিস বুকাইলী। যার লিখা সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। নীচে তার গ্রন্থ থেকে কিছু উদ্ধৃত হলো ঃ

"মাতৃজঠরে ভ্রূণের বৃদ্ধির বিশেষ পর্যায় সম্পর্কে কুরআনের যে বর্ণনা তার সাথে ভ্রূণের ক্রমবিবর্তন সংক্রান্ত আমাদের আজকের আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্যজ্ঞান পুরোপুরিভাবে মিলে যায়। শুধু তাই নয়, এ বিষয়ে কুরআনের এমন একটি বক্তব্যও খুঁজে পাওয়া যায় না আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্য জ্ঞানের আলোকে যে বক্তব্যের সমালোচনা কিংবা বিরোধিতা করা যেতে পারে।

উক্ত বর্ণনার পর কুরআন আমাদেরকে আরও জানিয়ে দিচ্ছে—এরপর ভ্রূণ এমন একটা পর্যায় অতিক্রম করে যাকে বলা যেতে পারে চিউড ফ্লেশ বা চিবানো গোশতের মত। এরপর দেখা দেয় ভ্রূণের অস্থিময় পেশী এবং পরে তা আবৃত্ত হয় গোশতের দ্বারা কুরআনে এ স্থলে যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, তা আগেকার চিবানো গোশতের ব্যবহৃত শব্দের চেয়ে আলাদা। এ পরবর্তী শব্দের দ্বারা "অক্ষত গোশত বুঝানো হয়েছে"–(সূরা আল মুমিনূন ঃ ১৪) "আমরা সেই দৃঢ়ভাবে আটকিয়ে থাকা বস্তুটিকে পরিণত করি চিবানো গোশতের পিণ্ডরূপে। অতপর এই চিবানো গোশতকে হাড়ে হাড্ডিতে রূপ দেই এবং হাড়ের উপরে দেই আবরণ অক্ষত গোশতের দ্বারা।"

"চিবানো গোশতের" মূল আরবী "মুদগা"। আর অক্ষত গোশতের আরবী "লাহাম"। দু'টি শব্দের মধ্যে এই যে পার্থক্য এ পার্থক্যের উপরে আমরা সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে চাই। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কল্যাণে আজ আমরা জানতে পারছি যে, প্রজনন ক্রিয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ে ভ্রূণটি থাকে

www.pathagar.com

একটি ক্ষুদ্রাকৃতি পিণ্ডের মত। এরপর সেই পিণ্ডটি বৃদ্ধি পেতে থাকে। বৃদ্ধির বিশেষ পর্যায়ে এটাকে খালি চোখে দেখায় যেন অবিকল চিবানো গোশতের একটা টুকরা। ভ্রুণের দেহের হাড়ের কাঠামো গড়ে উঠে এ চিবানো গোশত পিণ্ডের ভিতরেই। বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় "মেসেনচাইমা" এভাবে এর ভিতরে ভ্রুণের যে হাড় হাড্ডি হয় তা আবৃত্ত করা হয় পেশী দ্বারা। আরবী 'লাহাম' শব্দটি এ মাংশপেশীর ব্যাপারেই প্রযোজ্য।

এটা আজ সবারই জানা যে, মাতৃগর্ভে বৃদ্ধির কালে ভ্রুণের দেহের কোনো অংশ কি রকম অসম ও বেমানান থাকে। এ অসম অবয়বই পরবর্তীকালে পূর্ণাঙ্গ একটা মানুষে পরিণত হয়। উল্লেখ্য যে, গর্ভস্থ দেহাবয়বের এ অসম বেমানান অংশের পাশাপাশি কোনো কোনো অংশ থাকে আবার পুরোপুরিভাবেই সুষম মানানসই।

কুরআনের ২২নং সূরার ৫নং আয়াতে 'মুখাল্লাক' বলে যে শব্দটি রয়েছে যার অর্থ 'সুষম ও মানানসই আকৃতি প্রদান'। ভ্রুণের বৃদ্ধির এ রহস্যময় ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে কুরআনের উক্ত আয়াতে বলা হচ্ছে ঃ

"আমরা আকৃতি প্রদান করি এমন কিছুতে যা দৃঢ়ভাবে আটকানো থাকে। তৈয়ার করি গোশতের একটা পোটলা যা আকারে সুষম এবং বেমানান।"

ভ্রুণ অবস্থায় ইন্দ্রিয়ানুভূতির আবির্ভাব ও নাড়িভুড়ি তৈরি হওয়ার কথাও কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। (দ্রঃ) সূরা সাজদা, আয়াত ৯)

"(আল্লাহ) দিয়েছেন তোমাদের জন্য কর্ণ ও চক্ষুর অনুভূতি এবং নাড়িভূড়ি।" ভ্রুণের যৌনযন্ত্র গঠনের কথাও কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে।" (দ্রঃ)-(সূরা আন নজম, আয়াত ৪৫-৪৬)

"(আল্লাহ) বানিয়ে থাকেন দুই মিলিয়ে এক জোড়া পুরুষ এবং নারী, সামান্যতম পরিমাণ শুক্র হতে যখন তা নির্গত হয়।" কুরআনের আরও দু'টি আয়াতে ভ্রূণ অবস্থায় নারী-পুরুষের জননযন্ত্র গঠনের কথা বলা হয়েছে, যথা ঃ সূরা ফাতির, আয়াত ১১ এবং সূরা কিয়ামাহ, আয়াত ৩৯।

আমরা আগেই বলে নিয়েছি, কুরআনে বর্ণিত মানব প্রজনন সম্পর্কিত সব বক্তব্যই আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত, সুপ্রমাণিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত সত্যের সাথে তুলনামূলকভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা হবে এবং আমরা তা দেখলামও। দেখা গেল বিজ্ঞানের সত্য এবং কুরআনের তথ্যের মধ্যে সুস্পষ্ট মিল বিদ্যমান। এ পর্যায়ে কুরআন যখন নাযিল হয়েছিল সে আমলে মানব প্রজনন সম্পর্কে

www.pathagar.com

প্রচলিত ধ্যান-ধারণা কিরূপ ছিল তারও বিচার-বিশ্লেষণ হওয়া আবশ্যক। তুলনামূলক এ পর্যালোচনা এ জন্যেই জরুরী যে তৎকালে মানুষের মধ্যে কুরআনে উল্লেখিত এসব সমস্যা, বিষয় ও বর্ণনা সম্পর্কে আদৌ কোনো ধারণা ছিল কিনা তা নির্ণয় করা। এখানে একটা বিষয় সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, আজ আমরা যে রকমভাবে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের তথ্য উপাত্তের সহায়তায় কুরআনের বিভিন্ন বর্ণনার অর্থ ও ব্যাখ্যা তুলে ধরতে পারছি সেকালের মানুষদের পক্ষে আদৌ তা সম্ভব ছিল না। অর্থাৎ মানব প্রজনন সংক্রান্ত সঠিক কোনো ধারণা সেকালের মানুষদের ছিল অজ্ঞাত। আসলে কেবলমাত্র ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসেই প্রজনন সংক্রান্ত বিষয়ে কিছুটা স্পষ্ট ধারণা ও সুস্পষ্ট জ্ঞান মানুষের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। মধ্যযুগের আগাগোড়াই মানব প্রজনন সম্পর্কে যতসব আজগুবী ধারণা প্রচলিত ছিল তা গড়ে উঠেছিলো অসার উপকথা আর কল্পনাপ্রসূত যতসব ভিত্তিহীন মতবাদের দ্বারা। মধ্যযুগের পরেও কয়েক শতাব্দী যাবত এসব ভিত্তিহীন মতবাদ জোরেশোরে চালু ছিল। ভ্রূণতত্ত্বের সঠিক ইতিহাসের মজবুত বুনিয়াদ প্রথম গড়ে উঠেছিলো বিজ্ঞানী হারভের বক্তব্যের মাধ্যমে (১৬৫১ খৃষ্টাব্দে)। হারভের সেই থিওরীতে বলা হয়েছিল—"সমস্ত জীবনের উৎপত্তি ঘটে মূলত ডিম্ব-ডিম্বাণু থেকেই।" এ সময়ে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা অব্যাহত ছিল। অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে (আলোচ্য বিষয়ে অর্থাৎ মানব প্রজনন সম্পর্কে) মানুষের তথ্য জ্ঞানের পরিধি ক্রমান্বয়ে সবিস্তৃত হতে শুরু করে। মানুষের মুখে মুখে তখন ফিরছিল প্রজননের ক্ষেত্রে ডিম্বাণু ও শুক্রকীটের রহস্যময় ভূমিকার কথা। সুবিখ্যাত প্রকৃতি বিজ্ঞানী বাফুন এই "এগ" থিওরির সমর্থক ছিলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তখনো অপর এক সুবিখ্যাত বিজ্ঞানী বোনেট সমর্থন করে চলছিলেন, 'বীজের পুটলি বাধা থিওরীকে'। এ থিওরী অনুসারে মা হাওয়ার ডিম্বাশয়ে (ওভারী) নাকি গোটা মানবজাতির সমস্ত বীজ একটা পুটলির ভিতরে আরেকটা পুটলি এভাবে একত্রে পুটলি বাধা অবস্থায় ছিল। মজার কথা এই যে, অষ্টাদশ শতকে এসে এ পুটলি বাধা থিওরী নতুন করে সর্বত্র জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

অথচ আমাদের সময় থেকে সহস্রাধিক বছর আগে মানব জাতির মধ্যে যখন প্রজনন সংক্রান্ত এ ধরনের নানা মনগড়া ও ভ্রান্ত মতবাদের প্রাধান্য বিরাজ করছিল তখনও কিন্তু কুরআনের মধ্যেই বিদ্যমান ছিল মানব জাতির জন্য এতদসংক্রান্ত সঠিক তথ্য ও সুষ্ঠ জ্ঞান। যদিও কুরআনে মানব প্রজনন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সেসব সত্য প্রকাশিত হয়েছিল একান্ত সহজ সরল ভাষায় তথাপি কুরআনের সেই চিরায়ত সত্য উদঘাটনের ও আবিষ্কারের জন্য

www.pathagar.com

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষকে অপেক্ষা করতে হয়েছে।' ডঃ মরিস বুকাইলী। বইঃ 'বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান' পৃঃ ২৭৭-২৮০। বঙ্গানুবাদ ঃ আখতারুল আলম।

কুরআনে বৈজ্ঞানিক তথ্য ঃ তিন

এ বিশ্ব এক সময় ধুম্রকুণ্ডলী আকারে বিরাজমান ছিল এ তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে এই মাত্র কয়েক বছর আগে। আর এ আবিষ্কারের জন্য পদার্থ বিজ্ঞানীদেরকে দিনের পর দিন মাসের পর মাস, বছরের পর বছর অবিরাম গবেষণা চালাতে হয়েছে, অতপর পদার্থ বিদ্যার আর ভূবিদ্যার যখন চরম উৎকর্ষ সাধন হলো তখন আবিষ্কার হলো যে, এ বিশ্ব এক সময় ধুম্রকুণ্ড (AN OPAQUE HIGHLY AND HOT GASEOUS COMPOSITION) ছিল। অথচ এ তথ্য কুরআনের সূরা হ-মীম আস সাজদায় বর্ণিত হয়েছে আজ থেকে চৌদ্দ শত বছর আগে। যেখানে আল্লাহ বলেছেন ঃ

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ۚ قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ۝ (حم السجدة : ١١)

"অতপর তিনি (আল্লাহ) আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন যা ছিল ধুম্রকুণ্ড এবং বললেন (পৃথিবী ও অন্যান্য যাবতীয় গ্রহ নক্ষত্রকে) তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছা বা অনিচ্ছায়। তারা বললো আমরা স্বেচ্ছায় আসলাম।"
-(সূরা হামীম সাজদা ঃ ১১)

নিরক্ষর মুহাম্মদ (স) কোথায় পেয়েছিলেন এ তথ্য ? অন্য কোনো মানুষ কি তাকে এ সকল সরবরাহ করেছে ? যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে সে মানুষটি নিজের নামে এ সকল প্রকাশ করলেন না কেন ? তাছাড়া যে যুগে মুহাম্মদ (স) জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে যুগে পদার্থ বিদ্যার এমন উন্নতি সাধিত হয়েছিল বলে বিশ্ব ইতিহাসের কোথাও তো খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং ইতিহাস সে যুগ সম্পর্কে কি বলে এবং এ তথ্য আবিষ্কারের পর বিজ্ঞানীগণ কি মন্তব্য করেছেন তার কিছু নজির দেখুন ঃ

"Thinking where Muhammad came from I think it is almost impossible that he could have known about things like the common origin of the universe, because Scientists have only found out within the last few years, with very comlicated and advanced technological Methods, that this is the case, Somebody, who did not know something about nuclear

www.pathagar.com

physics fourteen hundred years ago could not, I think, be a position to find out from his own mind, for instance, that the earth and the heavens had the same origin" (DR ALFRED KRONER-professor of Geology and chairman of the department of Geology of Geoseiense, Johannes Gutenburg University Germany. বই a Brief Illustrated guide to understanding Islam by I. A. IBRAHIM আরও দেখুন "This is the Truth" Video Tape)

কুরআনে বৈজ্ঞানিক তথ্য ঃ চার

আজকের প্রাণীতত্ত্ববিদ ও পদার্থ বিজ্ঞানীগণ আবিষ্কার করেছেন যে, পৃথিবীতে বসবাসকারী প্রতিটি প্রাণী, উদ্ভিদ ও পদার্থ জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্ট। এমন কোনো প্রাণী কিংবা উদ্ভিদ অথবা পদার্থ খুঁজে পাওয়া যায় না যাতে নেগেটিভ পজেটিভ নেই। এটম, ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদি যা নিয়েই গবেষণা করা হোক না কেন। নেগেটিভ পজেটিভের এ আকর্ষণ যদি না থাকতো তাহলে বিদ্যুৎ চলতো না, সিমেন্টের সাথে ইট লেগে থাকতো না, দুনিয়ার কোথাও পাকা বাড়ী দৃষ্টিগোচর হতো না, তৈরি হতো না পীচ ঢালা পথ, তৈরী হতো না কোনো যানবাহন। যে হালকা অথচ শক্ত এক জাতীয় মেলামাইন বোর্ডের সাহায্যে তৈরি হয় প্লেনের খোলস তাও তৈরী করা সম্ভব হতো না যদি না নেগেটিভ পজেটিভের আকর্ষণ বিদ্যমান থাকতো। যে কলম দিয়ে আমরা লিখি তাও তৈরী হতো না, যদি না পদার্থের মধ্যে নেগেটিভ পজেটিভের আকর্ষণ বিরাজ করতো।

অথচ অবাক ব্যাপার এ তথ্য উচ্চারিত হয়েছে মরুর দেশে, জ্ঞান-বিজ্ঞানহীন এক যুগে। কুরআনের সূরা ইয়াসীনের ৩৬নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছেঃ

سُبْحٰنَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ○(يس : ٣٦)

"মহা বিজ্ঞ আর অতি পবিত্র সেই সত্তা যিনি প্রতিটি জিনিসকে সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়, যাদের কিছু উৎপন্ন হয় যমীন থেকে কিছু আবার এমন জায়গা থেকে যা মানুষ অবগত নয়, জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন তাদের (মানুষদের) নিজেদেরকেও।"–(সূরা ইয়াসীন ঃ ৩৬)

নিরক্ষর মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষে কেমন করে এ বৈজ্ঞানিক তথ্য দেয়া সম্ভব হলো যা কিনা বর্তমান জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগেই শুধু নয় বরং তার চেয়েও আরও বেশী অগ্রগামী।

www.pathagar.com

এসবে কি প্রমাণিত হয় না যে, মুহাম্মদ (স) এ কুরআন নিজে রচনা করেননি বরং তা এসেছে মহা বৈজ্ঞানিক আল্লাহর নিকট থেকে।

কুরআনে বৈজ্ঞানিক তথ্য ঃ পাঁচ

স্তন্যদানকারী প্রাণীকুলের দুধের বাটে দুধ কি পদ্ধতিতে আসে এ বিষয়টি আবিষ্কার হয়েছে মাত্র কয়েক বছর আগে আধুনিক রসায়নশাস্ত্র এবং শরীর বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক গবেষণার মাধ্যমে। অথচ এ পদ্ধতির কথা নবী মুহাম্মদ (স) বর্ণনা করেছেন সেই তখন যখন সারা বিশ্ব জুড়ে মায়েদের দুধের বাটে দুধ আসা নিয়ে নানান ধরনের আজগুবী কল্পকাহিনী প্রচলিত ছিল। সূরা আন নাহল-এর ৬৬ আয়াতে আল্লাহ বর্ণনা করেছেন ঃ

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ط نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ ○(النحل : ٦٦)

"নিশ্চয়ই গবাদিপশুর মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। আমি তোমাদেরকে পানের জন্য দিয়েছি যা তাদের দেহের অভ্যন্তরে অন্ত্রের বস্তুনিচয় (গোবর ইত্যাদি) এবং রক্তের সংযোগের ফলে দুগ্ধ হিসাবে আসে। যারা পান করে তাদের জন্য ইহা খুবই উপাদেয়।"

–(সূরা আন নাহল ঃ ৬৬)

চৌদ্দশ বছর আগে মরুর দেশে বসে একজন নিরক্ষর লোক কিভাবে এসব বৈজ্ঞানিক তথ্য লিখলেন যার প্রতিটি বিষয় আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে ? এতে কি প্রমাণ হয় না যে, এ কুরআন কোনো মানুষের রচনা নয় !

এ প্রসঙ্গে ডঃ মরিস বুকাইলির নিরপেক্ষ গবেষণা দেখুন "শরীরের সাধারণ পুষ্টির জন্য যে বস্তুটির প্রয়োজন তা পাওয়া যায় খাদ্য থেকে। খাদ্য বস্তু প্রথমে পরিপাক যন্ত্রে যায় এবং সেখানে তার রাসায়নিক রূপান্তর সাধিত হয়। সেই রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যে সারবস্তু বেরিয়ে আসে তা অন্ত্রে প্রবিষ্ট হলে আবার তার রূপান্তর ঘটে। এ রূপান্তরিত বস্তুটি একটি উপযুক্ত সময়ে অন্ত্রের আবরণের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসে এবং সরবরাহ যন্ত্রের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। রূপান্তরিত এ রাসায়নিক বস্তুটির এ যাত্রা দু'ভাবে কার্যকর হয় এক "লিমাফোটিক ভেসেল" বা রসবাহী নালী দ্বারা এবং দুই পরোক্ষভাবে প্রেটাল সার্কুলেশন' বা মুখবাহী নালী দ্বারা। এভাবেই সেই রূপান্তরিত রাসায়নিক বস্তুটি প্রথমে লিভারে নীত হয় এবং সেখানে তা আবার পরিবর্তিত হয়। অতপর সেই রূপান্তরিত রাসায়নিক বস্তুটি সেখান থেকে বেরিয়ে এসে যুক্ত হয় দেহের

www.pathagar.com

সরবরাহ যন্ত্রের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিতে। আর এভাবেই এ সর্বশেষ রূপান্তরিত রাসায়নিক বস্তুটি রক্তধারার সাথে মিশ্রিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে দেহের সর্বত্র।

দুধ যেসব উপাদানে তৈরি, সেসব উপাদান নিঃসৃত হয় 'মামারী গ্লাণ্ড" নামক দেহস্থিত একটি রসস্রাবী গ্রন্থি থেকে "মামারী গ্লাণ্ড" পরিপুষ্টি পায় খাদ্যের সেই সারবস্তু থেকে যে সারবস্তু উপরে উল্লেখিত বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও রূপান্তরের মাধ্যমে রক্ত ধারার সহায়তায় "মামারী গ্লাণ্ডে" পৌঁছায়। সুতরাং যাকিছুই খাদ্যবস্তু থেকে পাওয়া যায় রক্ত এবং একমাত্র রক্তই সেসব কিছুর সংগ্রাহক এবং নিয়ামক হিসাবে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। এভাবে এ রক্তই দেহের অন্যান্য যন্ত্রের মত মামারী গ্লাণ্ডেরও প্রয়োজনীয় পুষ্টি সাধন করে। আর এ প্রক্রিয়ায় রক্ত ও অন্ত্রের রাসায়নিক বস্তু সম্মিলিতভাবে "মামারী গ্লাণ্ডে" তৈরি করে থাকে দুগ্ধ উৎপাদনের উপাদান।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রাথমিক যে প্রক্রিয়াটি দেহ যন্ত্রের সবকিছুকে সক্রিয় করে রাখে সেই প্রক্রিয়ায় আর একটি বিশেষ কাজ হচ্ছে অন্ত্রের যাবতীয় বস্তুকে বিভিন্ন রাসায়নিক রূপান্তরের মাধ্যমে একটি সারবস্তুতে পরিণত করা এবং সেই সারবস্তুকে অন্ত্রের আবরণের মধ্য দিয়ে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে আসা যা সহজেই রক্ত ধারার সাথে মিশে যেতে পারে। দেহের পুরিপুষ্টি সাধনের ব্যাপারে এই যে এতসব তথ্য—এসব তথ্য আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হয়েছে (একান্ত আধুনিক যুগে এসে) আধুনিক রসায়নশাস্ত্র এবং শরীর বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক গবেষণা ও আবিষ্কারের ফলেই। এসব বিষয় মুহাম্মদ (সা)-এর আমলের কোনো মানুষের পক্ষে জানার বা ওয়াকিফহাল থাকার কোনো প্রশ্নই উঠে না। একান্ত আধুনিক যুগে এসে বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে আজ মানুষের পক্ষে এসব বিষয় জানা যেমন সম্ভব হয়েছে, তেমনি কেবল আধুনিক যুগে এসেই আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহায়তায় এতসব কিছু জানতে পারা ও বুঝতে পারাটা আমাদের পক্ষে হয়েছে সহজতর। বস্তুত শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় সারবস্তু সরবরাহকারী হিসেবে রক্তের এ ভূমিকা তথা রক্তের দ্বারা সারবস্তু সরবরাহের এ প্রক্রিয়াটি উদঘাটন তথা আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানী হারভে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার হাজার বছর পর।

অথচ হাজার বছর আগে অবতীর্ণ কুরআনে দুধ উৎপাদন প্রক্রিয়ার কথা বলতে গিয়ে রক্তের এ ভূমিকা সম্পর্কিত এ একই ধারার তথ্য ও বিষয়ের উল্লেখ সত্যিই বিস্ময়কর। আমার বিবেচনায় কুরআন যে আদৌ কোনো মানুষের রচনা নয়—এটা তার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।" ডঃ মরিস বুকাইলি, বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান পৃষ্ঠা-২৬৬-২৬৭, বঙ্গানুবাদ–আখতারুল আলম।

www.pathagar.com

কুরআনে বৈজ্ঞানিক তথ্য ঃ ছয়

জোতির্বিদ্যার ইতিহাসে পৃথিবী ও সূর্যের ঘূর্ণন নিয়ে কত কিছুই না হয়ে গেল। কেউ বলতো সূর্য ঘোরে, আবার কেউ বলতো সূর্য নয় পৃথিবী ঘোরে। সর্বশেষে বিজ্ঞানী গ্যালিলিওর কথাই সবাই মেনে নিয়েছিল যে, সূর্য স্থির আর পৃথিবী তার চারপাশ দিয়ে ঘুরছে। কিন্তু এই কয়েক বছর আগে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন যে, সূর্যও স্থির নয় সেও তার আপন কক্ষ পথে ঘুরছে এবং তারা আরও আবিষ্কার করলেন যে, শুধু পৃথিবী বা সূর্য নয় বরং মহাশূন্যে যাকিছুই রয়েছে তার সবই আপন আপন কক্ষপথে তীব্রবেগে ছুটে চলেছে অর্থাৎ মহাশূন্যে কোনো কিছুই স্থির নয়।

অথচ অবাক ব্যাপার একথা কুরআনে এসেছে আজ থেকে চৌদ্দশত বছর আগে। যেখানে আল্লাহ বলছেন ঃ

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط كُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ○

"তিনিই (আল্লাহ) সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিন এবং চন্দ্র ও সূর্য। আকাশ মণ্ডলের সবকিছুই আপন আপন কক্ষপথে বিচরণ করছে।"

–(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৩৩)

আরও বলা হয়েছে ঃ

وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ط ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ○ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ○ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ط وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ○(يس : ٣٨-٤٠)

"সূর্য তার নির্দিষ্ট কক্ষপথে আবর্তন করছে। এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ। চন্দ্রের জন্য আমি বিভিন্ন মনযিল নির্ধারিত করেছি। অবশেষে সে পুরাতন খেজুর শাখার মত আকার ধারণ করে।[১] সূর্য নাগাল পেতে পারে না চন্দ্রের এবং রাত্রিও অগ্রে চলে না দিনের। আকাশ মণ্ডলের সবকিছুই আপন আপন কক্ষপথে নিজস্ব গতিবেগ সহকারে পরিভ্রমণ করে চলেছে।"–(সূরা ইয়াসীন ঃ ৩৮-৪০)

১. চাঁদ হ্রাস পেতে পেতে মাসের শেষে ধনুকের আকার ধারণ করে। এখানে আরবদের পরিবেশ উপযোগী 'শুকনো খেজুর শাখার মত' বলে এর দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। এখানে আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি যে, কুরআন কোনো জোতির্বিদ্যার বই নয় বরং এটি হেদায়াতের গ্রন্থ। মানুষের হেদায়াতের উদ্দেশ্যেই এসব উদাহরণ এখানে টেনে আনা হয়েছে।

www.pathagar.com

এসব কি মুহাম্মদ (স)-এর কল্পনা ? সূর্য ও চন্দ্রের আবর্তনের এ তথ্য (যা বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে এইমাত্র কয়েক বছর আগে) তিনি সে যুগে বসে কিভাবে কল্পনা করলেন ? তাছাড়া সূর্য ও চন্দ্র ছাড়া আরও যেসব গ্রহ নক্ষত্র মহাশূন্যে বিরাজমান এগুলোর সবই আপন আপন কক্ষপথে ঘুরছে এসব তিনি কিভাবে জানলেন ?

কুরআনে বৈজ্ঞানিক তথ্য ঃ সাত

বিজ্ঞান আমাদেরকে আজ অবহিত করছে যে, পৃথিবী সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়ে এর ভূত্বক যতকাল ঠাণ্ডা হয়ে জমে যায়নি ততকাল তা ছিল অস্থির ও অস্থায়ী। এটি অতি সাম্প্রতিক আবিষ্কার। বিজ্ঞান আরও আবিষ্কার করেছে যে, এ পৃথিবীর বুকে অবস্থিত পাহাড় পর্বতগুলো পৃথিবীর স্থিরতা ও ভারসাম্যের জন্য পেরেকের ন্যায় কাজ করছে এবং পৃথিবী পৃষ্ঠের ভাজের উপর ভিত্তি করে পর্বতসমূহ দণ্ডায়মান। এসব খাজ ভাজের আয়তন কোথাও কোথাও আট/দশ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। এ খাজ-ভাজের প্রাকৃতিক অবস্থান থেকেই পৃথিবীসহ স্থিরতা লাভ করেছে। বিজ্ঞানীরা আরও বলেন ঃ

"Modern earth scienccs have proved that mountains have deep Roots under the surface of the ground and that these roots can reach several times their elevations above the surface of the ground. So the most suitable world to describe mounting on the basis of this information is the 'peg' (God saying : "Have we not made the earth as a bed and the mountains as pegs?" Qur'an 78 : 6-7) since most of a properly set peg is hidden under the surface of the ground.

The history of science tells us that the theory of mountains having deep Roots was introduced only in the later half at the nineteeth century." (The Geological concept of Mountains in the Qur'an, EL-Naggar, Page-5)

"Mountains also paly an important rolse in stabiliaing the crust of the earth."-(same Page : 44-45)

"Likewise the moodern theory of plate tectonics holds that mountain work as stabilizers for the earth. This knowledge about the role of mountains as stabilizers for the earth has just began to be understood in the framewook of plate tectonics

www.pathagar.com

Since the late 1960 (The Geological Concept of mountains in the Qur'an Page : 5)

Could any one during the time of the prophet Mohammad (peace be on him) have known of the True shape of mountains, could anyone imagine that the solid massive mountain which he sees before him actually extends deep into the earth and has a root, as scintinsts assert ? (A brief Illustrated guide to understanding Islam, page-13)

এ হচ্ছে অতি সাম্প্রতিক আবিষ্কার অথচ কুরআনে এ তথ্য বর্ণিত হয়েছে সেই তখন যখন পাহাড় নিয়ে মানুষ বৈজ্ঞানিক গবেষণা করবে দূরে থাক বরং এসব নিয়ে মানুষ কল্পকথা ও কিংবদন্তি শুনে দিন গুজরান করতো। সূরা আন নাবা-এর ৬-৭নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ○ وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ○(النبا : ٦-٧)

"আমি কি যমীনকে বিছানা এবং পর্বতমালাকে পেরেকের মত গেড়ে দেইনি ?"–(সূরা আন নাবা ঃ ৬-৭)

আরও বলা হয়েছে ঃ

وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَبِكُمْ وَاَنْهٰرًا وَّسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○

"তিনি (আল্লাহ) পৃথিবী পৃষ্ঠে পর্বতমালাসমূহ গেঁথে দিয়েছেন যাতে পৃথিবী তোমাদের নিয়ে না কাপে বা হেলে দুলে না পড়ে।"

–(সূরা আন নাহল ঃ ১৫)

আরও বলা হয়েছে সূরা লোকমানের ১০নং আয়াতে।

সুতরাং এসবে কি প্রমাণ হয় না যে, এ কুরআন কোনো মানুষের রচনা নয়।

কুরআনে বৈজ্ঞানিক তথ্য ঃ আট

আমরা সবাই জানি যে টাইগ্রীস, ইউফ্রেটিস, মিসিসিপি, ইয়াংসি প্রভৃতি নদীসমূহ ও বাংলাদেশের পদ্মা, মেঘনা, মোহনায় এবং পৃথিবীর আরও বহুস্থানে দু'টি সমুদ্র এক সাথে মিশেছে কিন্তু এক দেহে লীন হয় না। একই সাথে প্রবাহিত হচ্ছে দু' ধরনের পানি। একটি মিষ্টি অন্যটি লোনা, একটি ঘন অন্যটি হালকা। এটা এমন এক ব্যাপার যা শুধু খালি চোখে সমুদ্র দেখে বলে দেয়া সম্ভব নয়, বরং এ সম্পর্কে রায় দিতে গেলে পানির ঘনত্ব, স্বাদ, তাপ, রং

www.pathagar.com

ইত্যাদি নির্ণয় করতে হবে, আর এসব নির্ণয়ের জন্য দরকার অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির।

অথচ অবাক ব্যাপার, এ তথ্য উচ্চারিত হয়েছে নদী, সমুদ্র থেকে বহু দূরে মরুর দেশের এক নিরক্ষর ব্যক্তির মুখ দিয়ে, এমন এক সময় যখন এসব যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হওয়া দূরে থাক পানি নিয়ে গবেষণা করার চিন্তাও কারোও মাথায় আসেনি।

যেমনটা সূরা আল ফুরকান-এর ৫৩নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ج وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا ○ (الفرقان : ٥٣)

"তিনিই (আল্লাহ) দু'টি সমুদ্রকে এক সাথে প্রবাহিত করেছেন—একটির পানি গ্রহণযোগ্য, সুমিষ্ট, অন্যটির লোনা ও তিক্ত। তিনি উভয়ের মাঝখানে রেখে দিয়েছেন একটি অনতিক্রমনীয় প্রতিবন্ধকতা, যা লংঘন কোনোভাবে সম্ভব নয়।"–(সূবা আল ফুরকান ঃ ৫৩)

আরও বলা হয়েছে ঃ

وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرٰنِ ق هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهٗ وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ○

"দু'টি সমুদ্র সমান হয় না, একটির পানি গ্রহণযোগ্য, মিষ্ট ও তৃষ্ণা নিবারক এবং অপরটি লোনা ও স্বাদে কুটু।"–(সূরা ফাতির ঃ ১২)

আরও বলা হয়েছে সূরা আর রাহমানের ১৯, ২০নং আয়াতে। নীচে এ সম্পর্কিত একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রতি লক্ষ্য করুন ঃ

"Modern science has discovered that in the places where two different seas meet there is a barrier between them. This barrier divides the two seas so that each sea has its own temperature. salinity and density. For example Mediterranean sea water is warm. saline and less dense. compared to Atlantic Ocean water, When mediterranean sea water enters the atlantic over the Gibraltar sill it moves several hundres kilometers into the Atlantice at a depth of about 1000 meters with its own warm. saline and lees dense characteristies, The Mediterranean water stabilizes at this depth. Although these are large waves,

www.pathagar.com

strong currents and tide in this seas, they do not mix of transgress this barrier.[1]

"One may ask why did the Qur'an mention the partion when speaking about the devider between fresh and salt water, but did not nention it when speaking about devider between the two seas. Modern seicnce has discovered that in estuaries. where fresh (sweet) and salt water meet, the situation is somewhat different from what in bound in places where two seas meet."[2] It has been discovered that what distinguishes fresh water from salf water in estuaries is a pycnocline zone with a marked density discontonuity separating the two layers, This partion (zone of separating) has a defferent salinity from the fresh water and from the salt water."[3]

"This information has been discovered only recently using advanced equipment to measure temperature, salinity density, oxygen dissolubility etc. The human eye cannot see the difference between the two seas the meet rather the two seas appear to us an one homogeneous sea. Likewise, the human eye cannot see the division of water in estuaeies into the three kinds : fresh water, salt water and the partion (zone of seperation)."[4]

পাঠকদের সমীপে উপরে যে আট ধরনের বৈজ্ঞানিক তথ্য আমি উপস্থাপন করলাম শুধু এসবই নয়, কুরআন কারীমে এমন আরও বহু বিজ্ঞান বিষয়ক তত্ত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে যা শুধু গবেষণার অপেক্ষা মাত্র।

এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, এতসব বৈজ্ঞানিক তথ্য কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে, নিরক্ষর মুহাম্মদ (স) কোত্থেকে সংগ্রহ করলেন এসব ? কেউ কি তাকে এসব সরবরাহ করেছিল ? যদি করে থাকে, তাহলে কে সে ? মুহাম্মদ (স)-এর শত্রুরাও তো এমন কোনো ব্যক্তির সন্ধান করতে পারেনি যে কিনা এগুলো সরবরাহ করেছে। তাছাড়া এসব তথ্য সরবরাহ হবেই বা কোত্থেকে ? সে যুগে পৃথিবীর কোথাও বিজ্ঞান চর্চার অস্তিত্ব ছিল—ইতিহাসে

1. Principles of Oceanography. Davis, Page 92-93.
2. A brief illustrated Guide to Understanding Islam 19.
3. Oceanography, Gross, 242.
4. A brief illustrated Guide to Understanding Islam 19.

www.pathagar.com

কোথাও তো এর প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাহলে কি মুহাম্মাদ (স) অন্য কোনো আসমানী কিতাব থেকে এসব সংগ্রহ করেছেন ? কিন্তু তাও তো আজ পর্যন্ত কেউ প্রমাণ করতে পারেনি। না অতীতে পেরেছে, না বর্তমানে। বরং বর্তমানের বৈজ্ঞানিক গবেষণা তো দেখাচ্ছে মুহাম্মদ (স) যে যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে যুগে অবিকৃত খাটি ঐশী কিতাবের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। যেগুলোকে ঐশী কিতাব বলে দাবী করা হতো তা ছিল ধর্মীয় পুরোহিতদের হাতে লিখা হরেক রকম কিচ্ছা কাহিনী মাত্র। এ সম্পর্কে একজন নিরপেক্ষ গবেষক কি লিখেছেন দেখুন–

"আমরা দেখেছি, বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে বাইবেলের পুরাতন নিয়মে (তাওরাতে) যেসব বক্তব্য বিদ্যমান বিজ্ঞানের তথ্য প্রমাণের আলোকে তা একটাও গ্রহণযোগ্য নয়। অবশ্য এতে বিস্মিত হওয়ার তেমন কিছু নেই। কেননা বাইবেলের যে সেকেরডেটাল পাঠ থেকে আমরা বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে যেসব বক্তব্য পাচ্ছি সেসব রচিত হয়েছিল ইহুদীদের ব্যবিলন থেকে উৎখাতের প্রাক্কালে পুরোহিতদের দ্বারা। এ পুরোহিতরা সে সময়ে এমনভাবে বাইবেলের এসব বাণী রচনা করেছিলেন, যেসব বাণীতে তাদের নিজেদের মনমত ধর্মতাত্ত্বিক অভিমতই শুধু প্রতিফলিত হতে পেরেছিল। তাছাড়া বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে বাইবেলের বক্তব্যের সাথে কুরআনের বক্তব্যের এই যে দুস্তর ব্যবধান তা আরো একটি কারণে সবিশেষ গুরুত্ব লাভের অধিকারী। তাহলো ইসলামের শুরু থেকেই মুহাম্মদ (স)-এর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ উত্থাপন করে আসা হচ্ছে যে, তিনি বাইবেলের বর্ণনা হুবহু নকল করে কুরআন রচনা করেছিলেন। কিন্তু কুরআনের বাণী ও বাইবেলের বক্তব্যের মধ্যে উপরে বর্ণিত ব্যবধানই প্রমাণ করছে যে, এ অভিযোগ একান্ত অমূলক। বিশেষত বিশ্বসৃষ্টির ব্যাপারে বাইবেল ও কুরআনের বাণীর এ আলোচনার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, মোহাম্মদ (স)-এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত উপরোক্ত অভিযোগ একেবারেই ভিত্তিহীন আর যদি এ অভিযোগ সত্য বলে ধরে নেয়াও হয় তাহলে সে অবস্থায় এখানে যে প্রশ্নটি না জেগে পারে না তাহলো চৌদ্দশত বছর আগে আবির্ভূত হয়ে কি করে একজন মানুষের পক্ষে বাইবেলের বাণীর ভুল-ত্রুটি এমন যথাযথভাবে সংশোধন করা সম্ভব ? কিভাবে তার পক্ষে সম্পূর্ণ নিজের জ্ঞানবুদ্ধি মোতাবেক বাইবেল থেকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ত্রুটিপূর্ণ বাণীসমূহ বাদ দিয়ে এমন সব বাণী ও বক্তব্য রচনা করে কুরআনে সন্নিবেশিত করা সম্ভব। যা এতদিন এতকাল পরে কেবলমাত্র আজকের বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার দ্বারা সত্য বলে প্রমাণিত হতে পারছে ?

www.pathagar.com

সুতরাং কুরআন মুহাম্মদ (স)-এর নিজস্ব রচনা কিংবা তিনি বাইবেলের বাণী থেকে নকল করে কুরআনের বাণী তৈরী করেছিলেন বলে যে ধারণা পোষণ করা হয় সে ধারণা আদৌ সত্য ও সমর্থনযোগ্য নয়। কেননা, বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কিত কুরআনের বাণী ও বর্ণনা বাইবেলের বাণী ও বক্তব্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।"–(বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান পৃঃ ২০২-২০৩, ডঃ মরিস বুকাইলি। অনুবাদ আখতারুল আলম)

ডঃ মুরিস বুকাইলি আরো লিখেছেন ঃ

"কুরআনের বাণীতে বিজ্ঞান সংক্রান্ত বহুবিধ সুনির্দিষ্ট বক্তব্য আমাকে গোড়াতেই বিশেষভাবে বিস্মিত করেছিল। সেই থেকে এ যাবতকাল আমি কুরআনের বিজ্ঞান সংক্রান্ত এসব বিষয়ের অর্থ ও তাৎপর্য নির্ণয়ে নিরত রয়েছি। স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছি, কোনো এক ব্যক্তির পক্ষে এককভাবে কুরআনের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বাণীর অর্থ ও বিশ্লেষণ খুঁজে বের করা আদৌ সম্ভব নয়। উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য সম্বলিত কুরআনের বাণী সংখ্যায় সুপ্রচুর। আর এসব বাণী অবতীর্ণ ও সংকলিত হয়েছিল তেরশত বছরেরও আগে। অথচ এত বিভিন্নমুখী বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্বলিত হয়েও সেসব বাণী আধুনিক বৈজ্ঞানিক সত্যের সাথে কিভাবে যে এতবেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারলো, সে বিষয়টাই আমাকে বিস্মিত করেছে সবেচেয় বেশী। গোড়াতে ইসলাম সম্পর্কে আমার কোনো আস্থা কিংবা বিশ্বাস যাই বলা হোক তেমন কোনো কিছুই ছিলো না। সুতরাং সম্পূর্ণ খোলা মন নিয়ে আমি কুরআনের বাণীসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যাপৃত হয়েছিলাম এবং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই আমি হাত দিয়েছিলাম এ দুরূহ গবেষণাকর্মে। সত্যি কথা বলতে কি, এ কাজে কোনো কিছুর প্রভাবের কথা যদি বলতে হয় তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে, যৌবনে আমি যে শিক্ষাটা পেয়েছিলাম সেটাই আমার উপরে সবিশেষ প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল। আমি দেখেছিলাম, পাশ্চাত্যে সাধারণত মুসলমানদের কথা উঠলেই তাদের 'মোহামেডান' বলে চিহ্নিত করা হয়। এর তাৎপর্য একটাই, এ 'মোহামেডান' শব্দের দ্বারা একথাই বোঝাতে চাওয়া হয় যে, ইসলাম ধর্মটা আসলে জনৈক ব্যক্তির প্রতিষ্ঠিত ধর্ম, সৃষ্টিকর্তার সাথে এ ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই, থাকতেও পারে না। অর্থাৎ এ ধর্ম আদৌ স্রষ্টা কর্তৃক প্রেরিত কোনো ধর্ম নয়। এ অবস্থায় পাশ্চাত্যের আর দশজন মানুষের মত আমিও স্বাভাবিকভাবেই ইসলাম সম্পর্কে ওই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে নিশ্চিত ছিলাম। তাছাড়াও ইসলাম সম্পর্কে নানা ধরনের ভ্রান্ত ধারণা পাশ্চাত্য জগতে বহুল পরিমাণে ছড়িয়ে রয়েছে। বস্তুত আমি

www.pathagar.com

বিস্মিত না হয়ে পারি না, যখন দেখি সাধারণ মানুষ তো বটেই পাশ্চাত্যের যে কোনো বিশেষজ্ঞও যে কোনো আলাপ আলোচনাকালে ইসলাম সম্পর্কে ওই একই ধরনের ভ্রান্ত ধারণা কি অবলীলায় এবং ক্ষেত্র বিশেষে কি পাণ্ডিত্যপূর্ণভাবেই না তুলে ধরে থাকেন। সুতরাং আজ আমাকে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করে নিতে হচ্ছে যে, পাশ্চাত্যজগতের নিকট থেকে প্রাপ্ত এ ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত ভিন্ন আরেক ধারণা আমার কাছে স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত ইসলাম সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ রূপেই অজ্ঞ ছিলাম। ---

সেই সময় থেকেই আমি আরবী ভাষা (যে ভাষা আমি বলতে পারতাম না) শিখবার অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি। আমি বুঝতে পারি যে, ভ্রান্তির বেড়াজাল ছিন্ন করে ইসলামকে যদি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হয় তাহলে এ সম্পর্কে ব্যাপক অধ্যয়ন চালাতে হবে এবং সে জন্য নিজকে সবদিক দিয়ে উপযুক্ত করে তৈরী করে নিতে হবে। আমি আমার প্রাথমিক লক্ষ্য নির্ধারণ করে নিলাম। ঠিক করলাম আমার প্রাথমিক লক্ষ্য হবে আরবী ভাষাতেই কুরআন পড়তে শেখা এবং তার প্রতিটি বাণী প্রতিটি আয়াত আলাদা আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা। এ ধরনের অধ্যয়ন ও গবেষণা পরিচালনার বেলায় যে কারো নিকট যে বিষয়টা বড় হয়ে ধরা পড়বে তাহলো কুরআনে প্রকৃতি তথা বিজ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনার প্রাচুর্য। বস্তুত কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বিশ্ব সৃষ্টি, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূমণ্ডল গঠনে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদানের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ, পশু প্রজাতি, উদ্ভিদ জগত এবং মানব প্রজনন প্রভৃতি বিষয়ে এত অধিক আলোচনা রয়েছে যে, অভিভূত না হয়ে পারা যায় না। সবচেয়ে বড় কথা এসব বিষয়ের আলোচনায় বাইবেলের ভুলের পরিমাণ যেখানে পর্বত প্রমাণ সেখানে কুরআনের কোনো আয়াতের একটা মাত্র ভুলও আমি খুঁজে পাইনি। বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পদে পদেই আমাকে থেমে যেতে হয়েছে এবং প্রতিটি পর্যায়ে নিজেকেই আমি জিজ্ঞেস না করে পারিনি যে সত্যি সত্যিই কোনো মানুষ যদি এ কুরআন রচনা করে থাকেন, তাহলে সপ্তম শতাব্দীতে বসে কিভাবে তিনি জ্ঞান বিজ্ঞানের এতসব বক্তব্য এত সঠিকভাবে রচনা করতে পারলেন ? আর সেসব বক্তব্যই বা কিভাবে আজকের যুগের সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্য জ্ঞানের সাথে এতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারলো ?

এ স্থলে আরেকটা কথা স্পষ্ট করে বলা দরকার। তাহলো, কুরআনের বাণীসমূহ আজ আমরা যেভাবে পাচ্ছি, আমাকে যদি বলার অধিকার দেয়া হয় তাহলে আমি বলতে বাধ্য যে, কুরআনের এসব বাণী অবিসম্বাদিতভাবে

www.pathagar.com

সে যুগেরই বাণী এবং এ বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। এমতাবস্থায় উপরে কুরআন অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণের ফলাফলের যে কথা বললাম তার মানবীয় ব্যাখ্যা আর কি হতে পারে ? আমার স্পষ্ট অভিমত এই যে, এ ব্যাপারে দ্বিতীয় কোনো ব্যাখ্যা নেই। ফ্রান্সে তখন রাজত্ব করছিলেন রাজা ডাগোবার্ট (৬২৯-৬৩৯ খৃস্টাব্দ)। আর ঠিক সেই সময়ে আরব উপদ্বীপের বুকে বসে সেখানকার এক বাসিন্দা বিশেষ বিশেষ বিষয়ে কিভাবে জ্ঞান বিজ্ঞানের এমন সব বাণী প্রচার করছিলেন যেসব বাণী ও বক্তব্য সেই সময়ের থেকে তো বটেই সহস্রাধিক বছর পরের জ্ঞান বিজ্ঞানের থেকেও অগ্রগামী ?" (ডঃ মরিস বুকাইলি, বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান, পৃষ্ঠা–১৬২-১৬৫।–(অনুবাদ আখতারুল আলম)

শুধু কি এখানেই শেষ ? এরপর আরও কথা থেকে যায়। যদি মুহাম্মদ (স) কুরআন নিজে লিখতেন তাহলে তো তাকে অবশ্যই কমপক্ষে দশ-পনের বছর কোনো গোপন স্থানে থেকে শুধুমাত্র লিখার কাজে ব্যাপৃত থাকতে হতো। কারণ এমন বিরাট একটি গ্রন্থ (যা সাধারণ কোনো গদ্য নয়) লিখার জন্যে লিখককে অবশ্যই দশ-পনের বছর একাধারে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। অবশ্য কুরআন কারিম দশ-পনের বছরে দূরে থাক এতে যে বিস্ময়কর উনিশ-এর হিসাব রয়েছে (যা আমি পরে বর্ণনা করবো) এভাবে হিসাব রেখে যদি কেউ এমন গ্রন্থ রচনা করতে চায় তাহলে তাকে কম করে হলেও পাঁচ হাজার বছর আয়ু পেতে হবে। অথচ তিনি বেঁচেছিলেন মাত্র ৬৩ বছর এবং প্রথম অহী নাযিলের পর থেকেই তাকে শত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিন কাটাতে হয়েছে। বছর তিনেক গাছের পাতা খেয়ে নির্বাসনে থাকতে হয়েছে অতপর শুধু নিজের দেহখানি নিয়ে মাত্র একজন সংগী সাথে করে পলাতক অবস্থায় মক্কা থেকে সুদূর মদীনায় হিজরত করলেন। এহেন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কিভাবে তিনি এমন একটি দুরূহ গ্রন্থ রচনা করলেন ?

www.pathagar.com

কুরআনে 'উনিশ' সংখ্যার বিস্ময়কর মিল

'উনিশ' সংখ্যাটি নিয়ে গবেষণার সূত্রপাত সূরা আল মুদ্দাসসির-এর ৩০নং আয়াতটি নিয়ে। যেখানে বলা হয়েছে "এর উপর রয়েছে উনিশ"। এ আয়াতটির কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যাও রয়েছে আমি সে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যাচ্ছি না। অবশ্য 'উনিশ'-এর উপর গবেষণালব্ধ এ ফলাফল যে আয়াতটির উক্ত ব্যাখ্যার সাথে (যা তাফসীর গ্রন্থসমূহে রয়েছে) সাংঘর্ষিক এমনটা মনে করার কোনো কারণ নেই। কারণ কুরআনকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ উম্মাতের জন্য মোযেজা বলেছেন। সুতরাং কোনো আয়াতের বাহ্যিক উদ্দেশ্যের পাশাপাশি এর অভ্যন্তরে যদি অন্য কোনো হিসাব নিকাশ বা সংখ্যাতাত্ত্বিক রহস্য লুকিয়ে থাকে তাহলে আশ্চর্যের কিছু নেই, তাছাড়া আল্লাহ যেহেতু কুরআনকে একদিকে হেদায়াতের গ্রন্থ এবং অন্যদিকে বিজ্ঞানময় মোজেযা বলেছেন সুতরাং এ কুরআন থেকে যদি নিত্যদিনই বৈজ্ঞানিক তথ্য ও অলৌকিক বিষয়াদি প্রকাশ পেতে থাকে তাহলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। এ প্রসঙ্গে এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি যে, কুরআনে বর্ণিত এসব বৈজ্ঞানিক ও অলৌকিক তথ্যাদি অবহিত হয়েই অধুনা তাওহীদের ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছে হাজার হাজার খৃস্টান আর মুশরিক সম্প্রদায়।

যা হোক, 'উনিশ' সংখ্যাটির এ হিসাব আমাদেরকে দেখাচ্ছে যে, যদি এভাবে গাণিতিক হিসাবে মিল রেখে কেউ কুরআনের মত এমন কোনো গ্রন্থ রচনা করতে যায় তাহলে তাকে প্রায় ৬০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ বার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। অর্থাৎ কুরআনকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এতবার পড়তে হবে শুধুমাত্র 'উনিশ'-এর গাণিতিক বন্ধন ঠিক রাখার জন্য এবং এ প্রচেষ্টার পর সে মাত্র একবারই সফলকাম হবে। সুতরাং এ কাজ সম্পন্ন করতে একটি মানুষকে কত বছর আয়ু পাওয়া দরকার তা সহজেই অনুমেয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে এ হিসাব কোথায় পাওয়া গেল ? এটা কি অনুমান করে বলা হলো ? না অনুমান নয়। এ হিসাব করে দিয়েছে কম্পিউটার। আমরা জানি যে, একটি কম্পিউটার (হাইস্পীড প্রসেসর সম্বলিত) কুরআনকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত SEARCH করতে সময় নেয় মাত্র ১০/১২ সেকেণ্ড। অর্থাৎ উদাহরণ স্বরূপ আর রহমান শব্দটি কুরআনে কতবার এসেছে তা কম্পিউটারের মাধ্যমে ১০ সেকেণ্ডের মধ্যেই বের করা সম্ভব। কিন্তু একজন মানুষ যদি এটা

www.pathagar.com

করতে যায় অর্থাৎ কুরআনকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়তে যায় তাহলে তার কমপক্ষে তিন দিন লাগবে। এমনিভাবে আরও ৫০/৬০টি শব্দ সূরায় সূরায় মিল রেখে যদি কেউ বিন্যাস করতে যায় তাহলে তার কয়েক হাজার বছর আয়ুর দরকার।

মুহাম্মদ (স)-এর যুগে কোথাও কম্পিউটার বা কম্পিউটার বিজ্ঞানের অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং কোনো মানব ব্রেন এমন অলৌকিক গাণিতিক বন্ধনসমৃদ্ধ গ্রন্থ কিছুতেই রচনা করতে পারে না।

'উনিশ'-এর এ গাণিতিক বন্ধন সম্পর্কে জনাব মুহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক "আল কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ মোযেজা এবং উনিশ" নামে একটি বই লিখেছেন। নিচে আমি সে বই থেকেই কিছু অংশ উদ্ধৃত করলাম ঃ

"কুরআনের আয়াতসমূহ নাযিলের ক্রমানুসারের দিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখি ৪র্থবার নাযিল হয়েছে ৭৪নং সূরা আল মুদ্দাসসিরের ১ম-৩০টি আয়াত যার ৩০নং আয়াতটি হলো "আলাইহা তিসআতা আশার" (তদুপরি উনিশ)। এখানে লক্ষণীয় যে, আর মাত্র ২৬টি আয়াত নাযিল করা হলে সূরাটি পূর্ণ হয়ে যেতো কিন্তু জিবরাঈল (আ) সূরাটির এ অবশিষ্ট আয়াতগুলো নাযিল করা বন্ধ রেখে নাযিল করলেন প্রথম নাযিল কৃত ৯৬ নম্বর সূরা আলাকের অবশিষ্ট ১৪টি আয়াত। প্রথমবার এ সূরার মাত্র ৫টি আয়াত নাযিল হয়েছিল। এবার আরো ১৪টি এসে যোগ হলো তাহলে এ সূরার এখন সর্বমোট কতটি আয়াত হলো ? নিশ্চয়ই উত্তর হবে ১৯ (উনিশ)। এটা কি করে ঘটলো যে উপরোল্লিখিত ওহীর ৩০নং আয়াতে উনিশ শব্দ উচ্চারিত হওয়ার পরপরই ১৯ আয়াত সম্বলিত একটি পূর্ণ সূরা করা হলো। অবিশ্বাসীরা হয়তো জবাবে বলবে এটা একটা নেহায়েত ঘটনাচক্র। এমনিই ঘটে গেছে। স্বীকার করি ঘটনাচক্র। হতেও পারে, বিচিত্র কিছু নয়। কিন্তু পাঠক কি লক্ষ্য করেছেন সর্বপ্রথম নাযিলকৃত ৯৬ নম্বর সূরা আল আলাকের প্রথম ৫টি আয়াতের শব্দ সংখ্যা হলো ১৯! যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য। এটা কি করে ঘটলো ? আবার ঘটনাচক্র ? এ ১৯টি শব্দের মধ্যে রয়েছে আবার ৭৬টি অক্ষর যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য (১৯×৪ =৭৬। এটা কি করে ঘটলো ? ঘটনাচক্র ? এ ১৯ আয়াত বিশিষ্ট সম্পূর্ণ সূরাটির মধ্যে রয়েছে মোট ২৮৫টি অক্ষর যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য (১৯× ১৫=২৮৫)। এটাও কি ঘটনাচক্র ? কুরআনের যে সূরাটি প্রথম নাযিল হলো স্বাভাবিক কারণেই তার ক্রমিক নম্বর হওয়া উচিত 'এক' কিন্তু না কুরআনে এর ক্রমিক নম্বর হলো ৯৬। কেন ৯৬ ? ৯৬ হলো এজন্য যে, কুরআনের সূরাগুলো শেষ দিক থেকে অর্থাৎ ১১৪, ১১৩, ১১২ এভাবে গুণে পিছনের

www.pathagar.com

দিকে সরে ৯৬ নম্বরে পৌছলে দেখা যায় সূরাটির অবস্থান হয় ১৯তম এবং এটাই হলো আসল উদ্দেশ্য। যে কেউ কোনো গ্রন্থ রচনা করতে হলে তাকে অবশ্যই সেজন্য প্রথম একটা পরিকল্পনা করতে হয়। যদি নবী মুহাম্মদ (স) কুরআন রচনা করেই থাকেন তাহলে তিনিও অবশ্যই সেজন্য পূর্বাহ্নে একটা পরিকল্পনা করেছেন। ধরুন তিনি পরিকল্পনা করেছেন যে, গ্রন্থটি ১১৪টি অধ্যায়ে লিখবেন। ১১৩-ও নয়, ১১৫-ও নয় কিন্তু ১১৪, কেন ১১৪ ? কারণ এ সংখ্যাটি ১৯ দিয়ে বিভাজ্য (১৯×৬ =১১৪) আল্লাহ কি বলেননি যে, যারা আল কুরআনকে নবী মুহাম্মদ (স)-এর রচিত বলবে আমি তাদের উপর উনিশ চাপিয়ে রাখবো। এটা কি করে ঘটলো যে কুরআনের মধ্যেও সূরা সংখ্যা ১১৪ যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য।[১]

"বিসমিল্লাহর প্রথম শব্দ 'ইসমি' সমগ্র কুরআনে আছে মাত্র ১৯বার ১৯ দিয়ে বিভাজ্য (১৯× ১=১৯) এটা কি করে ঘটলো ? অবিশ্বাসীদের তো উত্তর আছেই 'ঘটনাচক্র'। কম্পিউটারের সাহায্যে নির্ভুল গণনায় দেখা যায় সমস্ত কুরআনে আল্লাহ শব্দটির সংখ্যা হলো ২৬৯৮ যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য (১৯×১৪২=২৬৯৮)। কি করে ঘটলো ? আবার ঘটনাচক্র ? পরবর্তী তৃতীয় শব্দ আর রাহমান আছে মাত্র ৫৭ বার। এ সংখ্যাটিও ১৯ দিয়ে বিভাজ্য (১৯×৩=৫৭)। শেষ শব্দ 'আর রাহিম এ সংখ্যা ১১৪ যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য (১৯×৬=১১৪)।

এখন একথা অকাট্য সত্য যে, কুরআনের প্রথম আয়াতে ১৯টি অক্ষর আর এ আয়াতের চারটি শব্দ সমগ্র কুরআনে ১৯ বা ১৯ এর বিভাজ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।[২]

"পবিত্র কুরআনই হচ্ছে দুনিয়া ব্যাপী ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য ধর্মগ্রন্থের মধ্যে একমাত্র গ্রন্থ যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো নির্দিষ্ট কতগুলো সূরার প্রথমে এক বা ততোধিক বিচ্ছিন্ন হরফ দিয়ে শুরু করা হয়েছে। আর এ হরফ বা হরফ সামষ্টিক পূর্ণ আয়াত ধরা হয় এবং বলা হয় মুকাত্তাআত বা বিচ্ছিন্ন অক্ষরসমূহ। কুরআনে মোট আরবী অক্ষর সংখ্যা ২৮টি (হামযা এবং আলিফকে এক অক্ষর ধরে) তন্মধ্যে ঠিক অর্ধেক বিভিন্ন ১৪টি অক্ষর দিয়ে মোকাত্তাআত তৈরি হয়েছে। আবার এ ১৪টি অক্ষর এককভাবে বা সমষ্টিগতভাবে মোট ১৪ প্রকার মোকাত্তাআত হিসেবে কুরআনের ২৯টি সূরার প্রথমে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এ তিনটি সংখ্যার যোগফল ৫৭ যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য (১৪+১৪+২৯=৫৭=১৯ ×৩) এখন এক অক্ষরের মোকাত্তাআত বিশিষ্ট একটি সূরা পরীক্ষা করতে

১. আল কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ মোজেযা এবং উনিশ, পৃঃ ৬৫, ৬৬, ৭১ লেখক মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক।
২. আল কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ মোজেযা এবং উনিশ, পৃঃ ৬৫, ৬৬, ৭১ লেখক মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক।

www.pathagar.com

চাই। স্বাভাবিক কারণেই পরীক্ষার জন্য ৬৮ নম্বর সূরাটিকেই প্রথম পসন্দ করে নিতে হয়। কারণ কুরআনে মুকাত্তাআত বিশিষ্ট সূরাগুলোর মধ্যে এ সূরাটি সর্বশেষ সূরা হলেও নাযিলের দিক দিয়ে মুকাত্তাআত বিশিষ্ট সূরার মধ্যে এ সূরাটি সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছে। এ সূরাটির শুরুতে ব্যবহৃত হয়েছে নূন অক্ষরটি। কিন্তু যেহেতু কুরআনের সংখ্যাতাত্ত্বিক মোজেযা আবিষ্কারের জন্য ১৯ সংখ্যাটি একটি সুবিধাজনক চাবি হিসেবে আমাদের নিকট রয়েছে। তাহলে ৬৮ নম্বর সূরার প্রথমে ব্যবহৃত উক্ত নূন অক্ষরটি গোটা সূরাতে কতবার আছে গুণে দেখি না কেন ? গুণে দেখা গেল সূরাতে আছে মোট ১৩৩টি নূন যা ১৯ দিয়ে ভাগ করায় নির্ভুল উত্তর হলো ৭ (১৯×৭=১৩৩)। এক অক্ষরের মুকাত্তাআত বিশিষ্ট অন্য আরো দু'টি সূরা রয়েছে। সেগুলো হলো ৫০নং সূরা কাফ এবং ৩৮নং সূরা সাদ। আবার কাফ বিচ্ছিন্ন অক্ষরটি দু'টি সূরার শুরুতে ব্যবহৃত হয়েছে। ৫০ নম্বর সূরায়ে ব্যবহৃত হয়েছে একক অক্ষর হিসেবে এবং ৪২নং সূরার বিভিন্ন অক্ষর সমষ্টির অংশ হিসেবে। ৫০নং সূরার শুরুতে ব্যবহৃত হয়েছে কাফ বিচ্ছিন্ন অক্ষরটি এক অক্ষর বিশিষ্ট মুকাত্তাআত হিসেবে এবং সূরাটির নামও হলো 'কাফ'। ৪২নং সূরা আশ শুরার প্রথমে ব্যবহৃত হয়েছে ৫ অক্ষর বিশিষ্ট মুকাত্তাআত যার শেষ অক্ষরটি হলো 'কাফ'। যদি আমরা এ ৫টি অক্ষর যথা হা, মীম, আইন, সীন এবং কাফ সংশ্লিষ্ট সূরা ৪২-এ যতবার আছে সে সংখ্যাগুলো যোগ করি তাহলে দেখবো সর্বমোট সংখ্যা ৫৭০ যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য (১৯×৩০=৫৭০।"[১]

এভাবে কুরআনের ২৯টি সূরার সমুদয় বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলো নিয়ে যদি কেউ গবেষনা করে তাহলে সে দেখতে পাবে কুরআন রচিত হয়েছে একটি অভূতপূর্ব গাণিতিক কাঠামোর উপর ভিত্তি করে। আর এভাবে এ ধরনের গাণিতিক মিল রেখে কখনো কোনো মানুষ গ্রন্থ রচনা করতে যায় না বরং প্রতিটি লেখকের লক্ষ্য থাকে বইয়ের উদ্দেশ্য, বাক্যের গঠন, বক্তব্যের যথার্থতা, উপকারিতা, ভাষার লালিত্য ইত্যাদির প্রতি। কোনো লেখক অক্ষর গুণে গুণে এমন একটি বেজোড় এবং জটিলতম সংখ্যার সাথে মিল রেখে গ্রন্থ রচনা করেছে এমন দৃষ্টান্ত দুনিয়ার ইতিহাসে কোথাও নেই।

সুতরাং এটা কারো বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, এক মহা শক্তিমান ও মহাকুশলী সত্তার নিকট থেকে এসেছে এ গ্রন্থ এবং তিনি এটিকে অবিকৃত রাখার জন্য এমন এক পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, মানুষ যা করতে সক্ষম নয়। প্রশ্ন উঠতে পারে গাণিতিক বন্ধনের এ হিসাবের কথা আল্লাহ কুরআন নাযিলের

১. আল কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ মোজেযা এবং উনিশ, পৃঃ ৬৫, ৬৬, ৭১ লেখক, মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক।

www.pathagar.com

প্রাক্কালে মানুষকে অবহিত করাননি কেন ? একটু চিন্তা করলেই এর জবাব খুঁজে পাওয়া সম্ভব। তা হচ্ছে এ গ্রন্থের রচয়িতা (অর্থাৎ আল্লাহ) এটিকে অবিকৃত রাখার জন্য যে সমস্ত গোপন পন্থা অবলম্বন করেছেন তা শুরুতেই প্রকাশ করে দেবেন না। এটিই স্বাভাবিক। তাছাড়া গাণিতিক হিসাবের মোযেজা দেখানো কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্যেও নয়।

তবে এ গ্রন্থের প্রেরক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এটা বলেছেন যে ঃ

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَارَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ط قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

"আর কুরআন সে জিনিস নয় যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ তা বানিয়ে নেবে। অবশ্য এটি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়ন করে এবং সে সমস্ত বিষয়ের বিশ্লেষণ দান করে যা তোমার প্রতি দেয়া হয়েছে, যাতে কোনোই সন্দেহ নেই যে, তা এসেছে এ বিশ্বের রবের নিকট থেকে। মানুষ বলছে যে, এটি তুমি বানিয়ে এনেছ ; বলে দাও এর কোনো সূরার মত একটি সূরা তোমরা বানিয়ে নিয়ে আস আর ডেকে নাও যাদেরকে নিতে পার আল্লাহর বিপক্ষীয়দের মধ্য থেকে।"–(সূরা ইউনুস ঃ ৩৭-৩৮)

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَايَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ○ (بنى اسرائيل : ٨٨)

"বলুন (হে নবী) যদি সমগ্র মানবজাতি এবং জিন সম্প্রদায় কুরআনের অনুরূপ রচনা করে আনয়নের জন্য জড়ো হয় তবু তারা তা পারবে না, তারা পরস্পরের যত সাহায্যকারী হোক না কেন।"

–(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮৮)

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ س وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ج اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ○

"এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের মনে কোনো সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি তাহলে এ গ্রন্থের যে কোনো একটি সূরার

www.pathagar.com

মত সূরা রচনা করে নিয়ে আস। আল্লাহর বিপক্ষীয় তোমাদের সেই সব সাহায্যকারীদেরকেও সংগে নাও যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। আর যদি না পারো অবশ্য তা কখনো পারবে না, তাহলে জাহান্নামের সেই আগুনকে ভয় কর যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর, যা প্রস্তুত করা হয়েছে অবিশ্বাসীদের জন্য।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৩-২৪)

www.pathagar.com

সূরা তাওবার শুরুতে বিসমিল্লাহ্ নেই কেন ?

আমরা জানি কুরআন কারীমের ৯নং সূরার শুরুতে "বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম" নেই। কেন নেই এ সম্পর্কে তাফসীর গ্রন্থ সমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, স্বয়ং মুহাম্মদ (স) এ সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ লিখাননি। পরবর্তী সময়ে কুরআন সংকলনের প্রাক্কালে সকলে এ মর্মে সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, হতে পারে, যেহেতু এ সূরাতে অর্থাৎ সূরার শুরুতেই কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেয়া হয়েছে, তাদের সাথে শান্তি ও নিরাপত্তার চুক্তিগুলো বাতিল করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে সে কারণে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম–এর মত সুন্দর ও করুণা সম্বলিত একটি প্রার্থনাবাক্য দিয়ে শুরু না করাই স্বাভাবিক। হয়তো এ কারণেই রাসূল (স) এ সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ লিখাননি।

যাহোক, কম্পিউটারের হিসাব আমাদের দেখায় যে, নিম্নোক্ত কারণগুলোর জন্যে সূরা তাওবার শুরুতে বিসমিল্লাহ নেই (আরও কারণ থাকা বিচিত্র নয়, এ ব্যাপারে প্রকৃত জ্ঞান আল্লাহর নিকট) সে কারণগুলো হচ্ছে ঃ

(১) কুরআনের ২৭নং সূরা আন নামল-এর ৩০নং আয়াতে একটি "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" রয়েছে, যদি এ আয়াতে বিসমিল্লাহ না থাকতো তাহলে সমস্ত কুরআনে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" এর সংখ্যা হতো ১১৩ যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য নয়। অধিকন্তু যদি সূরা তাওবার শুরুতেও বিসমিল্লাহ থাকতো তাহলে সমগ্র কুরআনে বিসমিল্লাহর সংখ্যা হতো ১১৫ যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য নয়।

অর্থাৎ এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা তাওবার শুরুতে বিসমিল্লাহ না দিয়ে যে ঘাটতির সৃষ্টি করেছেন তা পূরণ করেছেন সূরা আন নামল-এ, কিংবা সূরা আন নামল-এ বিসমিল্লাহ রেখে যে আধিক্য সৃষ্টি করেছেন তার সমাধান করেছেন সূরা তাওবার শুরুতে বিসমিল্লাহ না দিয়ে (অবশ্য এ কারণটির পাশাপাশি অন্য কোনো গোপন রহস্য থাকাও বিচিত্র নয়। এর প্রকৃত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর নিকট)।

(২) সূরা আন নামল-এর ৩০নং আয়াতে যদি বিসমিল্লাহ না থাকতো তাহলে সমগ্র কুরআনে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" এর চারটি শব্দ (যথা ইসম, আল্লাহ, আর রাহমান, আর রাহীম) সংখ্যার প্রত্যেকটি একটি করে কম হতো এবং সে ক্ষেত্রে এ শব্দগুলোর প্রত্যেকটি ১৯ দিয়ে বিভাজ্য

www.pathagar.com

হতো না। আবার যদি সূরা তাওবার শুরুতেও বিসমিল্লাহ থাকতো (নামল এর বিসমিল্লাহসহ) তাহলে শব্দ সংখ্যায় আধিক্য ঘটতো যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য হতো না। এ প্রসঙ্গে পাঠক সমাজের বুঝার সুবিধার্থে সূরা আন নামল এর ২৯, ৩০ এবং ৩১ আয়াত উদ্ধৃত করলাম ঃ

قَالَتْ يٰاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّيْ اُلْقِيَ اِلَيَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ ○ اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○(النمل : ٢٩ـ٣٠)

"তিনি (সম্রাজ্ঞী) বললেন—হে আমার পারিষদবর্গ ! আমাকে একটি সম্মানিত পত্র দেয়া হয়েছে পত্রটি এসেছে সুলাইমানের পক্ষ থেকে এবং তা এই বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম আমার মোকাবিলায় শক্তি প্রদর্শন করো না এবং বশ্যতা স্বীকার করে আমার কাছে উপস্থিত হও।"

–(সূরা আন নামল ঃ ২৯-৩০)

প্রিয় পাঠক, যে প্রশ্ন নিয়ে আমি আমার এ আলোচনা শুরু করেছিলাম তা ছিল কুরআন মুহাম্মদ (স)-এর নিজের লেখা কিনা।

এতক্ষণ একান্ত নিরপেক্ষভাবে যুক্তি ও বিজ্ঞানের আলোকে আমি এ প্রশ্নের জবাব দেয়ার চেষ্টা করেছি এবার কুরআন থেকে রাসূল (স)-এর নিরক্ষর হওয়া সম্পর্কে দলিল পেশ করছি ঃ

আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ○

"হে নবী আপনি তো এর পূর্বে কোনো কিতাব পাঠ করেননি এবং স্বীয় দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কোনো কিতাব লিখেনওনি। এরূপ হলে মিথ্যাবাদীরা অবশ্যই সন্দেহ পোষণ করতো।"–(সূরা আল আনকাবুত ঃ ৪৮)

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ط مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِيْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ط وَاِنَّكَ لَتَهْدِيْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○(الشورى : ٥٢)

"এমনিভাবে আমি আপনার নিকট আমার আদেশ সহকারে এক ফেরেশতা প্রেরণ করলাম। আপনি জানতেন না কিতাব কি এবং ঈমান কি। কিন্তু আমিই এটিকে (কুরআনকে) করেছি নূর, যা দিয়ে আমি আমার বান্দাদের

www.pathagar.com

মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা পথপ্রদর্শন করি। নিশ্চয়ই আপনি সত্য ও সঠিক পথপ্রদর্শন করে যাচ্ছেন।"–(সূরা আশ শুরা ঃ ৫২)

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْأُمِّيّٖنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ق وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ٥

"তিনিই (আল্লাহ) নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন আল্লাহর বাণীসমূহ, তাদেরকে উত্তম নৈতিক চরিত্রের প্রশিক্ষণ দেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমাত। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।"–(সূরা আল জুমআ ঃ ২)

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ٥ اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى ٥(النجم : ٣-٤)

"তিনি [রাসূল (স)] নিজের খুশীমতো কিছু বলছেন না বরং এ হচ্ছে তার প্রতি অবতীর্ণ প্রত্যাদেশ (অহী) মাত্র।"–(সূরা আন নাজম ঃ ৩–৪)

প্রশ্ন (দুই) ঃ কুরআন কি ঠিক সে রকমই আছে যেমন এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ কুরআন যে রকম নাযিল হয়েছিল ঠিক সে রকমটিই আছে। কোনো পরিবর্তন, পরিবর্ধন এতে হয়নি, এমনকি যের যবরেও না। আসুন কুরআন নাযিলের শুরু থেকে অদ্যাবধি পর্যন্ত ইতিহাসের দিকে একটু দৃষ্টি ফেরাই ঃ

কুরআন কিভাবে সংকলিত হয়

কারো কারো ধারণা যে, কুরআন যখন নাযিল হতো তখন তা লিখে রাখা হতো অতপর নবী মুহাম্মদ (স)-এর ইনতেকালের পর সেই লিখে রাখা জিনিসগুলো যেখানে যতটুকু পাওয়া গেছে তাই গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু আসলে প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। কুরআন নাযিলের সাথে সাথে তা লিখে রাখা হতো একথা অবশ্যই সত্য কিন্তু ঐ লেখার উপর ভিত্তি করে কুরআনকে গ্রন্থাবদ্ধ করা হয়নি। বরং কুরআনকে গ্রন্থাবদ্ধ করার সময় যে দু'টি প্রধান মাধ্যমকে সামনে রাখা হয়েছে তা ছিল (১) কুরআনের হাফেযগণ এবং (২) রাসূল (স)-এর বিশ্বস্ত ঐসব সাহাবীগণ যারা কুরআন নাযিলের সাথে সাথে তা লিখে রাখতেন।

অর্থাৎ কুরআনের হাফেযগণ একদিকে কুরআন তিলাওয়াত করতেন অপরদিকে তা লেখাসমূহের সাথে মিলিয়ে দেখা হতো। এভাবে সমগ্র কুরআনকে মিলিয়ে দেখার পরই তা গ্রন্থাকারে রূপ দেয়া হয়।

www.pathagar.com

অবস্থা এমন ছিল না যে, রাসূল (স) কুরআনের যে অংশ মনে রাখতে পেরেছিলেন তাই বুঝি লেখা হয়েছে যেটা মনে রাখতে পারেননি তা লেখা হয়নি। না প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। বরং রাসূল (স)-এর মানসপটে কুরআনকে গেঁথে দেয়ার দায়িত্ব ছিল স্বয়ং আল্লাহর। যে দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন ঃ

اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ ○ فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ○ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ ○

"একে (কুরআনকে) একত্রে সন্নিবেশিত করা এবং পড়িয়ে দেয়া আমাদের কাজ। অতএব আমরা যখন এটিকে পড়ি তখন আপনি সেই পড়ার অনুসরণ করুন। পরন্তু এর অর্থ বুঝিয়ে দেয়াও আমাদের কাজ।"

–(সূরা আল কিয়ামাহ ঃ ১৭-১৯)

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰى ○ اِلَّا مَا شَاۤءَ اللّٰهُ ط اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى ○

"আমরা আপনাকে এমনভাবে পড়াবো যে আপনি ভুলতে পারবেন না, অবশ্য আল্লাহ যা ভুলাতে চান তার কথা স্বতন্ত্র।"–(সূরা আ'লা ঃ ৬-৭)

রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর যখনই কুরআনের আয়াতসমূহ নাযিল হতো তখনই তিনি চিন্তান্বিত হয়ে পড়তেন যে, না জানি জিবরাঈল (আ) থেকে এর শ্রবণ ও অতপর নিজের পাঠের মধ্যে কোনো পার্থক্য হয়ে যায় কিনা কিংবা না জানি এর কোনো অংশ বা বাক্য নিজের স্মৃতি থেকে উধাও হয়ে যায় কিনা। এ দ্বিবিধ চিন্তায় জিবরাঈল (আ)-এর নিকট থেকে আয়াত শুনে তিনি তা দ্রুত আবৃত্তি করতেন যাতে বার বার পড়ে মুখস্থ করে নিতে পারেন। তার এ পেরেশানি দেখে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আয়াত নাযিল করেন যে, হে নবী–

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ○ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ ○ فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ○ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ ○ (القيمة : ١٦-١٩)

"এ অহীকে তাড়তাড়ি শিখে নেয়ার জন্য দ্রুত আবৃত্তি করবেন না। তা মুখস্থ করানো এবং একত্রে সন্নিবেশ করা আমাদের দায়িত্ব। সুতরাং আমি যখন তা পাঠ করি তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন। পরন্তু এর অর্থ বুঝিয়ে দেয়াও আমাদের কাজ।"–(সূরা আল কিয়ামাহ ঃ ১৬-১৯)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে গ্রন্থাবদ্ধকরণ ক্ষেত্রে কোনো মানবীয় ভুলত্রুটি কুরআনকে স্পর্শ করেনি। যদিও বাহ্য দৃষ্টিতে দেখা যায় যে, কুরআনকে একত্রে সন্নিবেশ করেছে একদল মানুষ কিন্তু পরোক্ষ থেকে অত্যন্ত কড়া ও সর্তক তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত ছিলেন সর্ব বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান আল্লাহ। আল্লাহ

www.pathagar.com

যেভাবে যে রকম চেয়েছেন ঠিক সেভাবে তার প্রিয় বান্দাদের দিয়ে এটি লিখিয়েছেন। সুতরাং কুরআনকে গ্রন্থে রূপদানের প্রাক্কালে এটির কোনো অংশ বাদ পড়ে গেল কিনা কিংবা লেখার বেলায় উলট-পালট হয়ে গেল কিনা এ সন্দেহ আসার কোনো অবকাশই নেই।

আল্লাহর রাসূল (স)-এর ইন্তেকালের পর কিছু লোক যাকাত দিতে অস্বীকার করলে এবং এটাকে ইস্যু করে ইসলামের বিরোধিতা শুরু করলে আল খলিফা আর-রাশেদ আবু বকর (রা) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তখন এসব যুদ্ধে কুরআনের বহু হাফেয শহীদ হন। এ অবস্থা লক্ষ্য করে ওমর আল ফারূক (রা) চিন্তা করলেন যে, কুরআন সংরক্ষণের ব্যাপারে মাত্র একটি উপায়ের উপর নির্ভর করা সমীচীন নয় বরং হিফজ করে রাখার সাথে সাথে তা কাজগপত্রে সংরক্ষণ করাও একান্ত বাঞ্ছনীয়। এ প্রয়োজনের কথা তিনি প্রথমে আবু বকর (রা)-কে অবহিত করেন। আবু বকর (রা) প্রথমে খানিকটা ইতস্তত করলেও পরে এ বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করে ওমর (রা)-এর সাথে একমত হন এবং যায়েদ ইবনে সাবিত আনসারী (রা)-কে (যিনি নবী করীম (স)-এর ব্যক্তিগত সেক্রেটারী ছিলেন)—এ মহান দায়িত্বে নিয়োজিত করেন। এভাবে ইতিহাসের সর্বোত্তম এবং সর্বাধিক আল্লাহ ভীরু ব্যক্তিগণের দ্বারা কুরআন গ্রন্থাবদ্ধ করার কাজ শুরু হয়। একদিকে জড়ো করা হলো কুরআনের সমুদয় লিখিত অংশসমূহ অপরদিকে কুরআনের হাফেযগণের [যাদের শিক্ষক ছিলেন স্বয়ং আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (স)] তিলাওয়াত শুনা শুরু হলো। এভাবে হাফেযগণের তিলাওয়াতের সাথে হুবহু মিলিয়ে দেখার পর কুরআন কারিমকে একটি গ্রন্থে রূপদান করা হলো। অতপর ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তৃতি ঘটলে তৃতীয় খলিফা ওসমান ইবনে আফ্ফান (রা) কুরআনকে আরও কপি করেন এবং বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নরদের নিকট এক এক কপি করে প্রেরণ করেন। এভাবে কুরআনের প্রথম কপি করার কাজও সম্পাদিত হয় রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রাণপ্রিয় সাহাবী, তৎকালীন সর্বাধিক তাকওয়াসম্পন্ন ব্যক্তি ওসমান ইবনে আফফান (রা)-এর মাধ্যমে। বর্তমান যুগে কুরআনের যে কপি আমরা দেখছি তা ঐ কপিরই হুবহু নকল। ওসমান (রা) কর্তৃক সম্পাদিত সেই কপিটি আজও ইস্তাম্বুলের যাদুঘরে রক্ষিত আছে। যদি কারোর সন্দেহ হয় তাহলে সেই কপির সাথে বর্তমান যুগের কপিকে মিলিয়ে দেখতে পারেন।

এমনিভাবে কুরআনের প্রেরক আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী এটি গ্রন্থাবদ্ধ হওয়ার পর তিনি এটিকে কিয়ামত অবধি মানব ব্রেইনে সংরক্ষণের আরও এক অতিরিক্ত পন্থাও অবলম্বন করলেন। সে পন্থা আর কিছু নয় ইসলামী উম্মাহর চির পরিচিত অতি আকাঙ্ক্ষিত তারাবী নামায। যে নামাযকে বহন করে আনে

www.pathagar.com

আর এক সম্মানিত মেহমান। সে মেহমানও আর কেউ নয় ইসলামী উম্মাহর প্রাণপ্রিয় মাস রমাদান।

আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (স)-এর জীবদ্দশয়ই এ তারাবী নামাযের নিয়ম প্রবর্তন হয় এবং কোনো বিরতি ছাড়া আজ অবধি তা চালু আছে। রাসূল (স)-এর জীবিতকালে মাসজিদ আল নববীতে যে পদ্ধতিতে এ নামায আদায় হতো ঠিক একই পদ্ধতিতে আজও সেখানে এ নামায আদায় হচ্ছে। শুধু পার্থক্য হচ্ছে এই যে, তখন লোক সংখ্যা কম ছিল আর বর্তমানে নামাযীর সংখ্যা হয় প্রায় লাখের কাছাকাছি কিংবা কখনো কখনো তারও বেশী। ঠিক একই পদ্ধতিতে মক্কায় মাসজিদুল হারামেও নামায আদায় হয়। যে বিষয়টি বলার জন্য আমি তারাবী নামাযের প্রসঙ্গ টেনে আনলাম তা হচ্ছে এই যে, এ নামাযে কুরআন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একবার তিলাওয়াত করা হয়। ইমাম তিলাওয়াতে ভুল করলে (এমনকি যের যবরের উচ্চারণেও) মুক্তাদীগণ তা সাথে সাথে শুধরে দেন। আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা মতে ইমামের সরাসরি পিছনের কাতারেই থাকেন ৮ থেকে ১০জন হাফেজ (মদীনায় মসজিদ আল নববী এবং মক্কায় মসজিদুল হারামে)। যখনই ইমাম কোথাও ভুল পড়েন সাথে সাথেই পিছনে দাঁড়ানো হাফেজগণের একজন তা শুধরে দেন। এ সিলসিলা চালু হয়েছে সেই রাসূল (স)-এর যুগ থেকে আর প্রথম ইমাম ছিলেন এমন এক ব্যক্তি যার ব্রেইনে কুরআন প্রবেশ করানো হতো এক সুপার ন্যাচারাল পদ্ধতিতে। অতপর যারা ইমাম হন তারা কুরআন মুখস্থ করেছিলেন এ ব্যক্তিটির [অর্থাৎ রাসূল (স)] নিকট থেকেই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এ তারাবী নামায কুরআনকে কোনোরূপ পরিবর্তন পরিবর্ধনের হাত থেকে রক্ষা করার শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে। আর এ ধারা চলে আসছে কুরআনকে গ্রন্থাকারে রূপ দানের পূর্ব থেকেই।

শুধু ঐ দুই মসজিদেই নয়, বিশ্বের সমস্ত মুসলিম দেশগুলোতে সেই একই পদ্ধতিতে তারাবী নামাযে কুরআন তিলাওয়াত হচ্ছে এবং ইমাম তিলাওয়াতে কোনো ভুল করলে তা শুধরে দেয়া হচ্ছে।

শুধু এ তারাবী নামাযই নয় মানুষের হৃদয়পটে কুরআন সংরক্ষণের আরও এক পন্থা চালু করে দিয়ে গেছেন স্বয়ং রাসূল (স)। তা হচ্ছে কুরআনের হিফজখানা। এসব হিফজখানা থেকে প্রতি বছর বের হচ্ছে হাজার হাজার হাফেজ। যদিও কোনো কোনো দেশে এসব হিফজখানাগুলোকে হেয় চোখে দেখা হয় এবং হাফেজদেরকে সমাজের বোঝা মনে করা হয় কিন্তু তথাপিও কুরআন হিফজ করার এ কর্মধারা কোথাও স্থগিত হয়ে যায়নি। এক দুর্বার

www.pathagar.com

আকর্ষণ নিয়ে মুসলিম বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরীরা এ গ্রন্থকে হিফজ করে যাচ্ছে। আরব দেশগুলোতে বিশেষ করে সৌদি আরবে কুরআনের হাফেজ তৈরী সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। এখানে কুরআনের হাফেজগণ সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি। এখানকার স্কুল, কলেজ ইউনিভার্সিটিগুলোতে কুরআনের হাফেজ তৈরির অনুপম ব্যবস্থা দেখলে অবাক হতে হয়। এ ধারা চালু রয়েছে সেই আল খুলাফা আর রাশেদীন থেকে।

www.pathagar.com

জনৈক ইয়াহুদী পণ্ডিতের একটি ঘটনা

ইমাম কুরতুবী এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি খলিফা মামুনুর রশিদ-এর আমলের। মাওলানা মুহীউদ্দীন খান সম্পাদিত মারিফুল কুরআনে কাহিনীটি এভাবে বিবৃত হয়েছে ঃ

"মামুনের দরবারে মাঝে মাঝে শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে তর্ক বিতর্ক ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হতো। এতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পণ্ডিত ব্যক্তিগণের অংশগ্রহণের অনুমতি ছিল। এমনি এক আলোচনা সভায় জনৈক ইয়াহুদী পণ্ডিত আগমন করলো। আকার আকৃতি, পোশাক ইত্যাদির দিক দিয়েও তাকে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মনে হচ্ছিল। তদুপরি তার আলোচনাও ছিল অত্যন্ত প্রাঞ্জল, অলংকারপূর্ণ এবং বিজ্ঞানসুলভ। সভা শেষে মামুন তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি ইয়াহুদী ? সে স্বীকার করলো। মামুন পরীক্ষার্থে তাকে বললেন, তুমি যদি মুসলমান হয়ে যাও, তবে তোমার সাথে চমৎকার ব্যবহার করা হবে। সে উত্তরে বললো ঃ আমি পৈতৃক ধর্ম বিসর্জন দিতে পারি না। কথাবার্তা এখানেই শেষ হয়ে গেল। লোকটি চলে গেল। কিন্তু এক বছর পর সে মুসলমান হয়ে আবার দরবারে আগমন করলো এবং আলোচনা সভায় ইসলামী ফিকাহ সম্পর্কে সারগর্ভ বক্তৃতা ও যুক্তিপূর্ণ তথ্যাদি উপস্থাপন করলো। সভাশেষে মামুন তাকে ডেকে বললেন ঃ আপনি কি ঐ ব্যক্তি যে বিগত বছর এসেছিলেন ? সে বললো ঃ হ্যাঁ আমি ঐ ব্যক্তিই বটে। মামুন জিজ্ঞেস করলেন ঃ তখন তো আপনি ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃত ছিলেন। এরপর এখন মুসলমান হওয়ার কি কারণ ঘটলো ?

সে বললো ঃ এখান থেকে ফিরে যাওয়ার পর আমি বর্তমান কালের বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে গবেষণা করার ইচ্ছা করি। আমি একজন হস্তলেখা বিশারদ। স্বহস্তে গ্রন্থাদি লিখে উঁচু দামে বিক্রি করি। আমি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তাওরাতের তিনটি কপি লিপিবদ্ধ করলাম। এগুলোতে অনেক জায়গায় নিজের পক্ষ থেকে বেশ কম করে লিখলাম। কপিগুলো নিয়ে আমি ইয়াহুদীদের উপাসানালয়ে উপস্থিত হলাম। ইয়াহুদীরা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে কপিগুলো কিনে নিলো। অতপর এমনিভাবে ইঞ্জিলের তিন কপি কমবেশ লিখে খৃস্টানদের উপাসনালয়ে নিয়ে গেলাম। সেখানেও খৃস্টানরা খুব খাতির যত্ন করে কপিগুলো আমার কাছ থেকে কিনে নিলো। এরপর কুরআনের বেলায়ও আমি তাই করলাম। এরও তিনটি কপি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করলাম এবং নিজের পক্ষ থেকে কম-বেশ করে দিলাম। এগুলো নিয়ে যখন বিক্রয়ার্থে বের

www.pathagar.com

হলাম তখন যেই দেখলো সেই প্রথমে আমার লেখা কপিটি নির্ভুল কিনা যাচাই করে দেখলো। অতপর বেশ-কম দেখে কপিগুলো ফেরত দিয়ে দিলো।

এ ঘটনা দেখে আমি এ শিক্ষাই গ্রহণ করলাম যে, গ্রন্থটি হুবহু সংরক্ষিত আছে এবং আল্লাহ নিজেই এর সংরক্ষণ করছেন। এরপর আমি মুসলমান হয়ে গেলাম।"-(তাফসীর মাআরিফুল কুরআন পৃষ্ঠা-৭২৬)

এসব ছাড়াও কুরআনের হরফ আল মুকাত্তাআত (বিচ্ছিন্ন অক্ষরসমূহ) এবং ঊনিশ সংখ্যাটির যে এক অভূতপূর্ব ও অতি আশ্চর্য গাণিতিক বন্ধন এতে পরিদৃষ্ট হয় তাতেও প্রমাণিত হচ্ছে যে, এ কুরআন যেমন নাযিল হয়েছিল আজও ঠিক তেমনি আছে, কোনো পরিবর্তন বা বিকৃতি এতে ঘটেনি, যদি ঘটতো তাহলে অত্যাশ্চর্য এমন গাণিতিক বন্ধন কখনোই কুরআনে থাকতো না, থাকা সম্ভবও নয়। কেন সম্ভব নয় তাও প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আলোচিত হয়েছে।

প্রশ্ন (তিন) ঃ এমন কি হয়েছে যে, কুরআন গ্রন্থাবদ্ধ করার সময় তা হুবহু লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়নি কিন্তু উলট-পালট হয়ে গিয়েছে কিছু কিছু বাদ পড়েছে ?

উত্তর ঃ না। এমনটি মোটেই হয়নি। হওয়া সম্ভবও ছিল না। কেন সম্ভব ছিল না তা এক এবং দুই নং প্রশ্নের উত্তরে আমি আলোচনা করেছি। এরপরও যদি কারোর সন্দেহ হয় তাহলে তিনি যেন কুরআনের মহা বিস্ময়কর গাণিতিক বন্ধন নিয়ে গবেষণা করেন। (জনাব মোহাঃ আবদুর রাজ্জাক রচিত "আল কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ মোযেজা এবং ঊনিশ" বইতেও এ ব্যাপারে যুক্তিভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে)

ইয়াহুদী ও খৃস্টানদেরকে আল্লাহর গ্রন্থ তাওরাত ও ইঞ্জিল হেফাজতের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। কিন্তু তারা সে দায়িত্ব পালন করেনি। কুরআনের বেলায় এমনটি নয়। এ কুরআনকে হিফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই নিয়েছেন। যেমন সূরা আল হিজর-এর ৯নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন ঃ

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ○ (الحجر : ٩)

"এ কুরআনকে আমি নাযিল করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।"

ধর্মীয় ব্যাপারাদিতে মুসলিম বিশ্বের শত অমনোযোগিতা আর অবহেলা সত্ত্বেও কুরআন হিফজ করার এ মহান কর্ম কোথাও থেমে নেই। আগে তো শুধু মানুষের বক্ষ পিঞ্জরে এবং কাগজে সংরক্ষণ হতো। কিন্তু এখন এর সাথে

www.pathagar.com

যোগ হয়েছে আর এক নতুন মাত্রা। আর তা হচ্ছে কম্পিউটার। এখন কম্পিউটার শুধু কুরআনকে সংরক্ষণই করে না, কুরআনকে এক অতি আশ্চর্য গাণিতিক বন্ধনসমৃদ্ধ গ্রন্থরূপে উপস্থাপন করে ধর্মবিমুখ লোকদের মুখে তালা লাগিয়ে দিচ্ছে। আরও অবাক ব্যাপার হচ্ছে কুরআনকে বুঝার জন্যে, কুরআনের আহ্বানকে মানুষের হৃদয় মনে আকর্ষিত করে তোলার জন্যে সৃষ্টি হচ্ছে হাজারো ইসলামী সাহিত্য। আরবী, ইংরেজী, বাংলা, ফারসি, উর্দু, হিন্দি, পশতু, মালি, ফিলিপাইনি, ইন্দোনেশিয়ান, মালয়েশিয়ান, তুর্কী, নেপালী, হামসাউয়ি, গিনি এবং আরও কত ভাষায় যে ইসলামী সাহিত্যের ভাণ্ডার গড়ে উঠেছে তার ইয়ত্তা নেই। এতে অবশ্য আশ্চর্যেরও কিছু নেই, কারণ আল্লাহ ঘোষণা করেছেন তিনি তার দ্বীনকে (ইসলাম) বিকশিত করবেনই। কুরআনের সূরা আস সফ-এর ৮নং আয়াতে তিনি বলেছেন,

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ○

"তারা মুখের ফুৎকারে আল্লাহর আলো নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্তু আল্লাহ তার আলোকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেনই যদিও কাফেররা তা অপসন্দ করে।"–(সূরা আস সফ ঃ ৮)

www.pathagar.com

কুরআনের ভাষালংকার

আল কুরআনুল কারীমের আর এক বিস্ময়কারিতা হচ্ছে এর তুলনাহীন ভাষা অলংকার। যদি কোনো আরবী ভাষীর সাথে আপনি কুরআনের ভাষায় কথা বলেন তাহলে দেখবেন আপনার শ্রোতাটি যারপরনাই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। এর কারণ হচ্ছে এই, কুরআনের ভাষায় এমন মধু আর অতুলনীয় কাব্যিক ছন্দ বিদ্যমান যে, যে কেউই এটি শ্রবণ করুক তার মধ্যেই আনন্দের ঝর্ণাধারা বয়ে যাবে। রাগান্বিত বা গোস্বা হয়ে বসে আছে এমন কোনো আরবী ভাষীর সাথে আপনি কুরআনের ভাষায় কথা বলুন, দেখবেন তার রাগ পানি হয়ে গেছে।

আরবীর উচ্চারণ বাংলায় লেখা যায় না তথাপিও নীচের উদাহরণ দু'টির দিকে নজর দিলে পাঠক কুরআনের রচনা শৈলীর ব্যাপারে কিছুটা আঁচ করতে পারবেন। যেমন ঃ

فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ ○ وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ ○ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ ○

هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ ○ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ○ عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ ○

রাসূলুল্লাহ (স)-এর মক্কী জীবনে দীর্ঘ তের বছর ধরে যত সূরা নাযিল হয়েছে তার সবই এমনি ধরনের কাব্যিক ছন্দে আল্লাহ রচনা করেছেন। অতপর রাসূলুল্লাহ (স) মাদানী জীবনে মহা কুশলী আল্লাহ কুরআনের বাকী অংশ নাযিল করলেন আর এক নতুন আঙ্গিকে। যেমন অনুপম সুন্দর ভাষা তেমনি উন্নত চরিত্রে মহিয়ান হওয়ার শিক্ষা এ যেন বিস্ময়ের পর বিস্ময়।

আরবের বড় বড় কবিদের অন্তর রাজ্যে প্রথম যে জিনিসটি বিপ্লব আনয়ন করে তা হচ্ছে, কুরআনের ভাষা লালিত্য। বানু সুলাইম গোত্রের এক প্রখ্যাত কাব্যিক কায়েস ইবনে নাসিরা—রাসূল (স)-এর মুখে কুরআন শ্রবণ করে সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং পরে নিজ গোত্রে গিয়ে সকলকে সমবেত করে বললেন দেখ, রোম ও পারস্যের সেরা কবি সাহিত্যিকদের রচনাদি শুনার ভাগ্য আমার হয়েছে, হামিরের খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের কথাবার্তাও আমি ঢের শুনেছি, কিন্তু মুহাম্মাদের মুখ নিঃসৃত কুরআনের বাণীর সমতুল্য আমি কারো কাছেই কিছু শুনিনি।

ওয়ালিদ ইবনুল মুগীরা, কুরআনের শত্রুতায় যে ছিল প্রথম কাতারে, মাক্কায় কাফেরদের একদিন সে সমবেত করে বললো, "হে কুরাইশগণ! হজ্জের

www.pathagar.com

মওসুম সমাগত। আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তোমাদের কাছে লোক আসছে। আর মুহাম্মদের কথা তারা ইতিমধ্যেই শুনেছে। সুতরাং তার সম্পর্কে তোমরা একটি সর্বসম্মত মত স্থির কর। এ ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে যেন কোনো রকম মতানৈক্য না থাকে। তাহলে একজনের কথা আরেকজনের কথা দ্বারা মিথ্যা প্রমাণিত হবে। সবাই বললো, তাহলে আপনিই একটা মত ঠিক করে দিন। ওয়ালীদ বললো বরং তোমরাই বলো, আমি শুনি। সমবেত সবাই বললো, আমরা বলবো, মুহাম্মদ একজন গণক। ওয়ালীদ বললো না, সে গণক নয়। আমরা অনেক গণককে দেখেছি। মুহাম্মদের কথাবার্তা গণকের ছন্দোবদ্ধ অস্পষ্ট কথার মতো নয়। লোকেরা বললো তাহলে আমরা বলবো মুহাম্মদ পাগল। ওয়ালীদ বললো না, সে পাগলও নয়। আমরা অনেক পাগল দেখেছি, আর পাগলামী কাকে বলে তাও জানি। পাগলের কথাবার্তায় জড়তা ও অস্পষ্টতা থাকে, প্রবল ভাবাবেগের মুর্ছনা এবং সন্দেহ সংশয়ে তা ভারাক্রান্ত থাকে, কিন্তু মুহাম্মদের কথায় তা নেই। সবাই বললো তাহলে আমরা বলবো, সে একজন কবি। ওয়ালীদ বললো, না, সে কবিও নয়। আমরা সব ধরনের কবিতা সম্পর্কে অবহিত। কিন্তু মুহাম্মদের কথা কোনো ধরনের কবিতার আওতায় পড়ে না।

এবার সকলে বললো তাহলে আমরা বলবো, সে যাদুকর। ওয়ালীদ বললো, সে যাদুকরও নয়। আমরা যাদুকর ও যাদু অনেক দেখেছি। কিন্তু তাদের মত গিরা দেয়া ও গিরায় ফুঁক দেয়ার অভ্যাস মুহাম্মদের নেই। সবাই বললো তাহলে আপনি কি বলতে চান ? ওয়ালীদ বললো এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মুহাম্মদের কথা শুনতে বেশ মিষ্টি লাগে। তার গোড়া অত্যন্ত শক্ত এবং শাখা প্রশাখা ফলপ্রসু। তোমরা যে কথাই বলবে তা মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হবে। তবে সবচেয়ে উপযুক্ত কথা হবে তাকে যাদুকর বলা। কেননা সে এমন সব কথা বলে যা ভাইয়ে ভাইয়ে, স্বামী স্ত্রীতে ও আত্মীয় স্বজনের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে যাদুর মতই কার্যকর। তাই তাকে যথার্থ যাদুই বলা চলে। এর প্রভাবে জাতি বাস্তবিকই বিভেদের শিকার হয়েছে।[১]

এভাবে কুরআনের সাহিত্যিক মান ও রচনাশৈলি নিয়েও যদি কেউ গবেষণা করে তাহলে সে বলতে বাধ্য হবে যে, না, কোনো মানুষ এমন সাহিত্য রচনা করতে পারে না।

যদি কেউ গায়ের জোরে বলে যে, কুরআন মুহাম্মদের রচিত তাহলে যে প্রশ্নটির জবাব না দিয়ে সে এক পাও সামনে এগুতে পারবে না তা হচ্ছে

১. সীরাতু ইবনে হিশাম ঃ ৬৫-৬৬।

www.pathagar.com

তাহলে মুহাম্মদ (স) কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করেছিলেন, কোন্ সব সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন যার ফলশ্রুতিতে তিনি এমন একটা বিরাট সাহিত্য গ্রন্থ রচনা করে ফেললেন ?

আমরা জানি, একটি বই লিখতে হলে কমপক্ষে দশটি বই পড়তে হয়। পড়া ছাড়া কেউ লেখক হতে পারে না। এ পৃথিবীতে যে যত বই লিখেছেন তারা তত পড়ুয়া ছিলেন।

মুহাম্মদ (স) কি পড়ুয়া ছিলেন ? তিনি তো লিখতে পড়তেই জানতেন না।

তাহলে কি অন্য কেউ তা লিখে দিয়েছে ? সে কাব্যিক নিজের নামে তা প্রকাশ করলো না কেন ? এমন কোনো কাব্যিকের সন্ধান কি ইতিহাস খুঁজে বের করতে পেরেছে যে কিনা একাধারে সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক, উন্নত নৈতিক গুণাবলী এবং মহান চরিত্র বলের অধিকারী ছিলো ? তাহলে কি শুধু মিথ্যার উপর এমন বিশ্বজোড়া বিপ্লব হয়ে গেল ? কিন্তু আমরা তো দেখি কোনো পরিবারের গার্জিয়ান যদি অসৎ হয়, নৈতিকতাহীন হয় তাহলে তার সন্তানাদিরাই তাকে ঘৃণা করে। দেশ, সমাজ জয় করাতো বহু দূরের কথা।

www.pathagar.com

কুরআনের সত্যতায় জিন জাতি

'জিন' আরবী শব্দ। আরবী ইংরেজী অভিধানে জিন কে Demon লেখা হয়েছে। ইংরেজী বাংলা অভিধানগুলোতে Demon-কে লিখা হয়েছে শয়তান, অপদেবতা, ভূত, প্রেত ইত্যাদি। যাহোক, Demon-এর অর্থ বাংলায় যা লেখা হয়েছে তা জিন জাতির জন্য প্রযোজ্য নয়। কারণ জিন শুধুই শয়তান নয়, জিনদের মধ্যে আল্লাহর প্রতি খাঁটি আনুগত্যশীল মুসলিমও রয়েছে। অপদেবতা, ভূত, প্রেত ইত্যাদি তো মুশরিক, মূর্খদের দেয়া নাম। যে সবের ভিত্তিতে এসব মূর্খরা রচনা করেছে হাজারো গাজাখুরি উপন্যাস।

সুতরাং জিনকে আরবীতে জিন বলাই যুক্তিযুক্ত। এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করছি। জিন জাতি সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য কাহিনীমূলক নয় বরং মানবজাতির শিক্ষা ও হেদায়াতের জন্য যতটুকু প্রয়োজন আল্লাহ ঠিক ততটুকুই মানুষকে জানিয়েছেন, এর বেশী নয়। উদাহরণ স্বরূপ মুশরিকদের কথা উল্লেখ করা যায়। আরবের মুশরিকগণ জাহেলী যুগে জিনদেরকে আল্লাহর শরীক মনে করতো, তাদের ধারণা ছিল জিনেরা আল্লাহর অধস্তন পুরুষ, এ বিশ্বের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনায় তারাও আল্লাহর সমকক্ষ। এভাবে তারা ঐসব জিনদের পূজা অর্চনায় লিপ্ত হতো আর নানারূপ আবদার জানাতো। শয়তান জিনেরা তাদের ক্ষমতা মতো সেসব আবদার পূরণ করতো আর বিনিময়ে মানুষকে কুফরী ও নোংরামীর শেষ সীমায় পৌঁছে দিতো। যেমন এ যুগেও কতিপয় কবর পূজক, গণক আর নেংটা সাধুদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। কুরআন এসব অপকর্মের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছে যে, এটা আল্লাহকে পাবার পথ নয় বরং এ পথ হচ্ছে শয়তানের, যে কিনা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু এবং এ জিন শয়তানদেরকে লেলিয়ে দেয়া হয়েছে তোমাদেরই পরীক্ষার নিমিত্ত।

'জিন' মানুষদের ন্যায় জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন, আত্মাধারী ও শরীরী জীব। পার্থক্য হচ্ছে মানুষ সৃষ্টির প্রথম উপকরণ মাটি আর জিনদের সৃষ্টি করা হয়েছে আগুনের শিখা থেকে (দ্রষ্টব্য সূরা আল হিজর ঃ ২৬-৩০)। জিনেরা মানুষকে দেখে কিন্তু মানুষ তাদেরকে দেখে না (দ্রষ্টব্য ঃ সূরা আল আরাফ ২৭) জিনদেরকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অসাধারণ, অস্বাভাবিক ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। যেমন তাদের চলার গতি মানুষের গতির মত নয়। হয়তোবা আলোর গতি আল্লাহ তাদেরকে দান করেছেন। আকাশ মণ্ডলে বিচরণের জন্য তাদের কোনো মহাশূন্যাযানের দরকার পড়ে না, অনায়াসে তারা ঊর্ধলোকে

www.pathagar.com

পাড়ি দিতে পারে। অবশ্য তার একটা নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে, যেখানে গেলে পরে তাদেরকে উল্কাপিণ্ড মেরে তাড়িয়ে দেয়া হয়। এ সীমার বাইরে যাওয়ার সাধ্য তাদের নেই।

কুরআনের সত্যতার আরও এক নজির হচ্ছে এই যে, এতে বহুবার মানুষ জাতির পাশাপাশি জিন জাতিকে উদ্দেশ করে বক্তব্য, হুশিয়ারী প্রদান করা হয়েছে। সূরা জিন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর কয়েকটি হাদীস আমাদেরকে এ অবগতি পেশ করে যে, জিনদের একটি দল কুরআন তিলাওয়াত শুনে কুরআনের প্রতি ঈমান আনে অথচ রাসূল (স) এ খবর জানতেন না, জেনেছেন তখন, যখন স্বয়ং আল্লাহ সূরা জিন অবতরণের মাধ্যমে রাসূল (স)-কে তা অবহিত করান।

সূরা জিন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রখ্যাত সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত কয়েকটি হাদীসের মাধ্যমে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুয়াত লাভের পূর্বে উচ্চতর জগতের খবরা খবর জানার জন্য জিনেরা আকাশ মণ্ডল থেকে কিছু একটা জেনে নেয়ার কোনো না কোনো সুযোগ পেয়ে যেত। কোথাও বা তারা আড়ি পেতে থাকতো ঊর্ধজগত থেকে সংবাদাদি সংগ্রহের জন্য। কিন্তু সহসা তারা দেখতে পেল চতুর্দিকে মালাইকাদের (ফেরেশতাদের) কড়া প্রহরা দাঁড়িয়ে গেছে। তারা কান পেতে কোনো কিছু শুনতে চাইলে তাদেরকে উল্কাপিণ্ডের মাধ্যমে প্রতিহত করা হচ্ছে। এ অবস্থা দর্শনে জিনেরা প্রমাদ গনল যে, নিশ্চয়ই পৃথিবীর বুকে কোনো নতুন ঘটনা ঘটেছে বা ঘটতে যাচ্ছে, কারণ আকাশ মণ্ডলের এ প্রহরা স্বাভাবিক কোনো নিয়ম নয়। অতপর জিনেরা স্থির করলো যে, পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমে, প্রতিটি আনাচে কানাচে নিজেদের প্রতিনিধি দল প্রেরণ করতে হবে। কি এ নতুন ব্যাপার তা খুঁজে বের করতে হবে। সে অনুযায়ী হেজাজে প্রেরিত প্রতিনিধি দলটি তখন মক্কা মোকাররমার অদূরবর্তী 'নাখলা' নামক স্থানে উপস্থিত হলো, রাসূল (স) তখন সাহাবীগণকে নিয়ে উক্ত স্থানে ফজরের নামায আদায় করছিলেন। জিনদের এ দলটি নামাযরত রাসূল (স)-এর মুখ থেকে কুরআনের পাঠ শুনে পরস্পর শপথ করে বলতে লাগলো—এ কুরআনই তো আমাদের ও আকাশের খবরাদির মধ্যে অন্তরায় হয়েছে। অতপর তারা স্বজাতির নিকট গিয়ে ঘটনা বর্ণনা করলো আর বললো আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি যা সত্য, সঠিক, নির্ভুল পথপ্রদর্শন করে। (দ্রষ্টব্য ঃ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)। কুরআন কারিমে সংক্ষেপে এ তথ্য বর্ণিত হয়েছে এভাবে ঃ

قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ○

www.pathagar.com

يَّهْدِىْ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ط وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ○ وَّاَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ○ وَّاَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ○ وَّاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ○ وَّاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا وَّاَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا ○ وَّاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّشُهُبًا ○ وَّاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ط فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا ○ وَّاَنَّا لَانَدْرِىْ اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِى الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ○ وَّاَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَمِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ ط كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ○

"হে নবী ! আপনি বলুন আমার প্রতি এ মর্মে আল্লাহ অহী করেছেন যে, জিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শুনেছে অতপর নিজেদের জাতির লোকদের নিকট গিয়ে বলেছে আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি, যা সত্য-সঠিক-নির্ভুল পথপ্রদর্শন করে। এজন্য আমরা এ কুরআনের প্রতি ঈমান এনেছি। এখন থেকে আমরা আর কখনোই আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবো না। আরও আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহর মর্যাদা অতীব উচ্চ ও মহান। তিনি কাউকে স্ত্রী বা পুত্র সন্তানরূপে গ্রহণ করেননি। আমাদের মধ্যকার নির্বোধ মূর্খ লোকেরা আল্লাহ সম্পর্কে অনেক অসত্য কথাবার্তা বলে আসছিলো। অথচ আমরা মনে করে আসছিলাম যে, মানুষ ও জিন আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলতে পারে না। মানুষদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক কতিপয় জিনদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছিল। আর এসব করে তারা জিনদের অহংকার অহমিকা আরও বৃদ্ধি করে দিয়েছে। তারা ধারণা করতো, যেমন তোমরা মানুষেরা ধারণা কর যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ কাউকে পুনরুত্থিত করবেন না। আমরা আকাশ মণ্ডল আতিপাতি করে খুঁজেছি, ফলে দেখেছি যে, তা পাহারাদারদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আছে এবং নক্ষত্ররাজি বর্ষিত হচ্ছে, আরও এই যে, পূর্বে আমরা কোনো কিছু শুনতে পাওয়ার উদ্দেশ্যে আকাশমণ্ডলে আসন গ্রহণ করার স্থান পেয়ে যেতাম। কিন্তু এখন যে-ই লুকিয়ে গোপনে কিছু শুনতে চেষ্টা করে, সে লুকায়িত স্থানে নিজের জন্য

www.pathagar.com

একটি প্রজ্জ্বলিত নক্ষত্র নিয়োজিত দেখতে পায়। আরও এই যে, আমরা বুঝতে পারতাম না পৃথিবীবাসীদের প্রতি কোনো খারাপ আচরণ করার সংকল্প করা হয়েছে, নাকি তাদের রব তাদেরকে সঠিক সরল পথপ্রদর্শন করতে চান। আরও এই যে, আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক আছে সৎকর্ম পরায়ণ আর কিছু আছে তাদের তুলনায় হীন, নীচ প্রকৃতির। আমরা বিভিন্ন পন্থায় বিভক্ত হয়ে আছি।"–(সূরা জিন ঃ ১-১১)

আল কুরআনুল কারীমে জিন জাতি সম্পর্কে এ সকল বক্তব্য এবং অপরদিকে কখনো কখনো জিনদের সাথে মানুষদের বাস্তব অভিজ্ঞতার বিষয়গুলো নিয়ে যদি কেউ গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেন তাহলেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে, এ কুরআন এসেছে এমন এক সত্তার নিকট থেকে যার নিকট দৃশ্য-অদৃশ্য বলতে কিছু নেই, মানুষ যা দেখে না তিনি তাও দেখেন, যার জ্ঞান থেকে কোনো কিছুই লুকায়িত থাকতে পারে না।

আরবের জাহিলিয়াত যুগের ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে, তখনকার লোকেরা পথ চলতে গিয়ে যদি কখনও নীরব নিথর বিরাণ ভূমিতে রাত্রি যাপন করতো তখন তারা চিৎকার করে বলতো ঃ "আমরা এ উপত্যকার অধিনায়ক জিনের আশ্রয় প্রার্থনা করি।" অর্থাৎ তারা এ ধারণা পোষণ করতো যে, প্রত্যেকটি জনশূন্য বিরাণ ভূমি কোনো না কোনো জিনের কর্তৃত্বাধীন অবশ্যই হবে এবং ঐ জিনের আশ্রয় ব্যতিরেকে সেখানে রাত্রিযাপন সম্ভব নয়। যেমনটা সূরা জিন এর ৬নং আয়াতে বলা হয়েছে। এমনি ধরনের আরও কত কিংবদন্তী আর কল্পকাহিনী যে জিনদেরকে নিয়ে প্রচলিত ছিল তার ইয়ত্তা নেই। অথচ অবাক ব্যাপার, সেই যুগেই, তাদেরই মাঝে বাস করে নিরক্ষর এক ব্যক্তি যিনি কখনো কিতাবাদি পাঠ করেননি, জিনদের সম্পর্কে এসব কুসংস্কার আর কল্পকাহিনীর অবসান করে তাদের এক নতুন পরিচয় পেশ করলেন। যে পরিচয় বর্ণিত হয়েছে তখন থেকে হাজার হাজার বছর পূর্বে গত হয়ে যাওয়া এক নবী সুলাইমান (আ)-এর জবানীতে, আর যে পরিচয়ের সত্যতার প্রমাণ করছে স্বয়ং জিনেরা। তাছাড়া নিরক্ষর এক নবী কি করে কল্পনা করলেন যে, জিনেরা আগুনের শিখা থেকে তৈরী ?

এসবে কি প্রমাণ হয় না যে, এ কুরআন এসেছে এমন এক সত্তার নিকট থেকে যিনি এ বিশ্বের সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান !

www.pathagar.com

কেমন ছিলেন এ কুরআনের বাহক

এতক্ষণ তো কুরআনের অলৌকিকতা ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদি নিয়ে আলোচনা হলো। এবার আমরা দেখবো এ কুরআন আমরা যার মাধ্যমে পেয়েছি তার চরিত্র কেমন ছিল।

এ কুরআনের বাহক হচ্ছেন সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র মহিমায় অভিভূত হয়ে আজকের কাফের বিচারকর্তৃগণও তাদের বিচারালয়ে তার কল্পিত মূর্তি স্থাপন করতে চায়। তাদের বক্তব্য এ পর্যন্ত এ বিশ্বে যত রাষ্ট্রনেতা, যত বিচারক, যত মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিসাবে তারা এ মুহাম্মদ (স)-কেই পেয়েছে, সুতরাং এহেন ব্যক্তির একটি স্মৃতিফলক অবশ্যই তাদের বিচারালয়ে থাকা দরকার।

এ স্বীকৃতি তারা দিয়েছে মুহাম্মদ (স)-এর চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে–কুরআনের মোযেজা দেখে নয়। যদি কুরআন নিয়েও গবেষণা করতো তাহলে তো দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতো।

এ কুরআনের বাহক হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি কিশোর বয়সেই সততা, বিশ্বস্ততা, আমানতদারীর জন্য আল আমীন উপাধি লাভ করেছিলেন। লোকেরা তার নিকট তাদের মূল্যবান জিনিসপত্রাদি গচ্ছিত রাখতো আমানত হিসেবে। কারণ সারা দুনিয়ার মানুষজনকে অবিশ্বাস করলেও এ ব্যক্তিকে কখনোই অবিশ্বাস করা যায় না। অথচ তিনি তখনো নবুয়াতে অভিষিক্ত হননি।

শৈশব থেকে এমন সব ঘটনা এ মহাপুরুষের জীবনে ঘটে আসছিলো যাতে প্রমাণ হচ্ছিলো এ শিশু সাধারণ মানুষ নন। এমনি এক ঘটনার এখানে উল্লেখ করছি এক প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থ থেকে।

হযরত হালীমা রাদিয়াল্লাহু আনহা, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুধ মা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, তিনি বর্ণনা করেছেনঃ

"বছরটি ছিল ঘোর অজন্মার। আমরা একেবারেই নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলাম। আমি একটি সাদা গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সাথে ছিল আমাদের বয়স্ক উটটি। সেটি এক ফোটা দুধও দিচ্ছিল না। আমাদের যে শিশু সন্তানটি সাথে ছিল, ক্ষুধার জ্বালায় সে এত কাঁদছিল যে, আমরা সবাই বিনিদ্র রজনী কাটাচ্ছিলাম। তার ক্ষুধা নিবৃত্ত করার মত দুধ আমার বুকেও ছিল না, উটটির পালানেও ছিল না। বৃষ্টি ও স্বাচ্ছন্দ লাভের আশায় আমরা উন্মুখ হয়ে

www.pathagar.com

ছিলাম। পথ ছিল দীর্ঘ। এক নাগাড়ে চলতে চলতে আমাদের গোটা কাফেলা ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। অবশেষে আমরা দুধ শিশুর খোজে মক্কায় উপনীত হলাম। আমাদের প্রত্যেককেই শিশু মুহাম্মদ (স)-কে গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু যখনই বলা হয় যে, তিনি পিতৃহীন তখন প্রত্যেকেই নিতে অস্বীকার করে বসে। কারণ আমরা সবাই শিশুর পিতার কাছ থেকে উত্তম পারিতোষিক প্রত্যাশ্যা করতাম। আমরা প্রত্যেকেই বলাবলি করতাম পিতৃহীন শিশু ! শিশুর মা আর দাদা কিইবা পারিতোষিক দিতে পারবে ? ইতিমধ্যে আমার সাথে আগত সকল মহিলাই একটা না একটা দুধ শিশু পেয়ে গেল। পেলাম না শুধু আমি। খালি হাতেই ফিরে যাবো বলে যখন মনস্থির করছি, তখন আমি আমার স্বামীকে বললাম আল্লাহর কসম ! এতগুলো সহযাত্রীর সাথে শূন্য হাতে ফিরে যেতে আমার মোটেই ভাল লাগছে না। আল্লাহর কসম ! ঐ ইয়াতীম শিশুটার কাছে আমি যাবোই এবং ওকেই নেব। আমার স্বামী বললেন নিতে পার। হয়তো আল্লাহ ওর ভেতরেই আমাদের জন্য কল্যাণ রেখেছেন। অতপর আমি গেলাম ও ইয়াতীম শিশুটিকে নিয়ে এলাম। আমি শুধু অন্য শিশু না পাওয়ার কারণেই তাকে নিতে বাধ্য হয়েছিলাম। তাকে যখন কোলে নিলাম, আমি অনুভব করলাম আমার স্তন যেন দুধে ভর্তি হয়ে গেছে। বাস্তবিকও তা-ই হলো, শিশু মুহাম্মদ (স) তা থেকে পেট ভরে দুধ খেলেন। তার দুধ ভাইও পেট ভরে দুধ খেল। অতপর দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়লো। অতচ ইতিপূর্বে তার জ্বালায় আমরা ঘুমাতে পারতাম না। আমার স্বামী আমাদের সেই উটটির কাছে যেতেই দেখতে পেলেন, সেটির পালানও দুধে ভর্তি। তিনি তা থেকে প্রচুর পরিমাণে দুধ দোহন করলেন এবং আমরা দু'জন তৃপ্ত হয়ে দুধ পান করলাম। এরপর বেশ ভালভাবেই আমাদের রাতটা কাটলো। সকাল বেলা আমার স্বামী বললেন, হালীমা, জেনে রেখ, তুমি এক মহাকল্যাণময় শিশু এনেছ। আমি বললাম বাস্তবিকই আমারও তাই মনে হয়।

এরপর আমরা রওয়ানা দিলাম। আমি গাধার পিঠে সওয়ার হলাম। আমার গাধা গোটা কাফেলাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চললো। আমার সহযাত্রীনীরা বলতে লাগলো, হে আবু যুয়াইবের কন্যা ! একটু দাঁড়াও, আমাদের জন্য অপেক্ষা কর। এটা কি তোমার সেই গাধা নয় যেটার পিঠে চড়ে তুমি এসেছিলে? আমি বললাম হ্যাঁ, সেইটাই তো। তারা বললো আল্লাহর কসম ! এখন এর অবস্থাই পাল্টে গেছে। অবশেষে আমরা বনি সাদগোত্রে আমাদের নিজ নিজ গৃহে এসে হাজির হলাম। আমাদের ঐ এলাকাটার মত খরা পীড়িত এলাকা দুনিয়ায় আর কোথাও ছিল বলে আমাদের জানা ছিল না। অথচ শিশু মুহাম্মদ (স)-কে নিয়ে বাড়ী পৌঁছার পরে প্রতিদিন আমাদের ছাগল ভেড়াগুলো খেয়ে

www.pathagar.com

পরিতৃপ্ত এবং পালান ভর্তি দুধ নিয়ে সন্ধ্যায় ফিরে আসতো। আমরা তা যথামত দোহন করে পান করতে লাগলাম অথচ অন্যান্য লোকেরা এক কাতরা দুধ দোহাতে পারতো না। তাদের ছাগল ভেড়ার পালানে এক ফোটা দুধও পেতো না। অতপর তারা তাদের রাখালদের বলতে লাগলো ঃ আবু যুয়াইবের কন্যার রাখাল যেখানে চরায় সেখানে নিয়ে চরাবে। তাদের রাখালরা আমার (হালীমার) মেষ চরানোর জায়গায় মেষ চরানো সত্ত্বেও মেষপাল ক্ষুধার্ত অবস্থায় ফিরে আসতে লাগলো এবং এক কাতরা দুধ তাদের পালানে থেকে পাওয়া যেতো না।

এভাবে ক্রমেই আমার সংসার প্রাচুর্য ও সুখ সমৃদ্ধিতে ভরে উঠতে লাগলো। এ অবস্থার ভেতর দিয়েই দু' বছর অতিবাহিত হলো এবং আমি শিশু মুহাম্মদ (স)-এর দুধ ছাড়িয়ে দিলাম। অন্যান্য ছেলেদের চেয়ে দ্রুত গতিতে তিনি বড় হয়ে উঠতে লাগলেন।"[৩]

ধর্মীয় যাজকগণ, যাদের নিকট তাওরাত, ইনজিল প্রভৃতি আসমানী কিতাবের জ্ঞান ছিল—সাক্ষ্য দিচ্ছিলেন, এ বালক শেষ যামানার প্রতিশ্রুত নবী ছাড়া আর কেউ নন। এমনি ধরনের আরও একটি ঘটনার এখানে উল্লেখ করছি। আবু তালিব এক কাফেলার সাথে সিরিয়ায় রওনা হবেন বাণিজ্যোপলক্ষ্যে। যাত্রার প্রাক্কালে বালক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাথে যাওয়ার আবদার করলেন। স্নেহ বিগলিত চাচা তার আবদার উপেক্ষা করতে পারলেন না। আবু তালেব তাকে সাথে নিয়ে সফরে বেরুলেন। কাফেলা বুসরা এলাকায় পৌছলে তার যাত্রা বিরতি করলো। সেখানে ছিলেন বাহীরা নামে এক খৃষ্টান পাদ্রী। এক গীর্জায় তিনি থাকতেন। ঈসায়ী ধর্ম সম্পর্কে তিনি ছিলেন খুবই পারদর্শী। দীর্ঘকাল ব্যাপী ঐ গির্জায় একখানা আসমানী কিতাব রক্ষিত ছিলো। পুরুষানুক্রমে ঐ জ্ঞানের উত্তরাধিকার চলে আসছিলো। বাহিরার কাছ দিয়ে তারা প্রায়ই যাওয়া আসা করতেন। কিন্তু তিনি কারো সামনে বেরুতেন না বা কারো সাথে কথাবার্তা বলতেন না। কিন্তু এ বছর যখন কুরাইশদের কাফেলা আবু তালিব ও বালক মুহাম্মদ (স) সহ ঐ স্থানে বাহীরার গীর্জার পাশে যাত্রা বিরতি করলো তখন বাহিরা তাদের জন্য প্রচুর খাদ্যের ব্যবস্থা করলেন।

বাহীরা থেকে বর্ণিত, গীর্জায় বসে তিনি এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখতে পান। কাফেলাটি এগিয়ে আসার সময় তিনি দেখেন যে, সমগ্র কাফেলার মধ্যে একমাত্র বালক মুহাম্মদ (স)-কেই আকাশ থেকে একখণ্ড মেঘ ছায়া দিয়ে

৩. সীরাতু ইবন হিশাম ৪০-৪২

www.pathagar.com

চলেছে। অতপর তারা একটা গাছের ছায়ায় যাত্রা বিরতি করলে মেঘ এবং সেই গাছের ডাল পালা মুহাম্মদ (স)-এর উপর ঝুঁকে ছায়া দিতে লাগলো। এ দৃশ্য দেখে বাহীরা গীর্জা থেকে বেরিয়ে আসলেন এবং লোক মারফত কাফেলার মানুষজনকে বলে পাঠালেন, হে কুরাইশ বণিকগণ! আমি আপনাদের জন্য খাওয়ার বন্দোবস্ত করেছি। আপনাদের মধ্যে ছোট বড় দাস বা মনিব সবাইকে এসে খাদ্য গ্রহণ করতে অনুরোধ করছি। কুরাইশদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বললো, হে বাহীরা ! আজকে আপনি নতুন মহিমায় মণ্ডিত হয়েছেন। ইতিপূর্বে আমরা বহুবার আপনার নিকট দিয়ে যাতায়াত করেছি। কিন্তু কখনো আপনি এরূপ আতিথেয়তা দেখাননি। আজকে আপনার এরূপ করার কারণ কি ? বাহীরা বললেন, সে কথা ঠিকই। আগে আমি এ করিনি। তবে আজ আপনারা আমার অতিথি।

অতপর সকলেই খেতে গেলেন। কিন্তু অল্প বয়স্ক হবার কারণে মুহাম্মদ (স) কাফেলার বহরের সাথে গাছের ছায়ায় বসে রইলেন। খাওয়ার জন্য সমবেত কুরাইশ বণিকদের সবাইকে ভালভাবে পরখ করে বাহীরা সেই পরিচিত হাবভাব ও চালচলনের কোনো লক্ষণ দেখতে পেলেন না, যা বালক মুহাম্মদ (স)-এর মধ্যে তিনি দেখেছিলেন। তাই তিনি বললেন, হে কুরাইশী অতিথিবৃন্দ, আপনাদের কেউই যেন আমার খাবার গ্রহণ থেকে বঞ্চিত না থাকেন। তারা বললো, হে বাহীরা যারা এখানে আসার মত তারা সবাই এসেছেন, শুধুমাত্র একটি বালক কাফেলার বহরে রয়েছে। সে কাফেলার মধ্যে কনিষ্ঠতম। বাহীরা বললেন না, তাকে বাদ রাখবেন না, তাকেও ডাকুন। জনৈক কুরাইশী বললো, লাত উয্যার শপথ। আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিবের ছেলে আমাদের সাথে থাকবে অথচ আমাদের খাবার গ্রহণ করবে না এটা হতেই পারে না। এটা আমাদের জন্য নিন্দনীয় ব্যাপার। একথা বলেই সে উঠে গিয়ে বালক মুহাম্মদ (স)-কে কোলে করে নিয়ে এলো এবং সবার সাথে খাবারের বৈঠকে বসিয়ে দিলো। এ সময় বাহীরা তার সমগ্র অবয়ব গভীরভাবে দেখতে লাগলেন এবং দেহের বিশিষ্ট নিদর্শনগুলো পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন, যার বিবরণ তিনি পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে পেয়েছেন। সমাগত অতিথিদের সকলের খাওয়া শেষ হলে এবং তারা এক এক করে সবাই বেরিয়ে গেলে বাহীরা বালক মুহাম্মদ (স)-এর নিকট এসে বললেন, হে বৎস! আমি তোমাকে লাত ও উয্যার দোহাই দিয়ে অনুরোধ করছি, আমি যা জিজ্ঞেস করবো তুমি তার জবাব দেবে। বাহীরা লাত ও উয্যার দোহাই দিলেন এজন্য যে, তিনি কুরাইশদের পরস্পর কথা বলার সময় ঐ দুই মূর্তির শপথ করতে শুনেছেন।

www.pathagar.com

বালক মুহাম্মদ (স) বললেন, আমাকে লাত ও উয্যার দোহাই দিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। আল্লাহর শপথ আমি ঐ দুই দেবতাকে সর্বাধিক ঘৃণা করি। বাহীরা বললেন—আচ্ছা, তবে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, যা জিজ্ঞেস করবো তার জবাব দেবে। মুহাম্মদ (স) বললেন—বেশ, কি কি জানতে চান বলুন। অতপর বাহীরা তাকে নানা কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, তার ঘুমন্ত অবস্থার কথা, তার দেহের গঠন প্রকৃতি ও অন্যান্য অবস্থার কথা। মুহাম্মদ (স) তার সব প্রশ্নের যা জবাব দিলেন তা বাহীরার জানা তথ্যের সাথে হুবহু মিলে গেল। তারপর তিনি তার পিঠ দেখলেন। পিঠে দুই স্কন্ধের মধ্যবর্তী স্থানে নবুওয়াতের মোহর অংকিত দেখতে পেলেন। মোহর অবিকল সেই জায়গায় দেখতে পেলেন যেখানে বাহীরার পড়া আসমানী কিতাবের বর্ণনা অনুসারে থাকার কথা ছিল।

এসব করার পরে বাহীরা আবু তালিবকে জিজ্ঞেস করলেন বালকটি আপনার কে ? তিনি বলেন, আমার ছেলে। বাহীরা বললেন, সে আপনার ছেলে নয়। এ ছেলের পিতা জীবিত থাকতে পারে না। আবু তালিব বললেন, বালকটি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। বাহীরা জিজ্ঞেস করলেন, ওর পিতার কি হয়েছিলো ? আবু তালিব বললেন, এ ছেলে মায়ের পেটে থাকতেই তার পিতা মারা গেছে। বাহীরা জবাব দিলেন ঠিক এ রকম হওয়ার কথা। আপনার ভ্রাতুষ্পুকে নিয়ে গৃহে ফিরে যান। খবরদার, ইয়াহুদীদের থেকে ওকে সাবধানে রাখবেন। আল্লাহর কসম ! তারা যদি এ বালককে দেখতে পায় এবং আমি তার যে নিদর্শন দেখে চিনেছি তা যদি চিনতে পারে তাহলে তারা ওর ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করবে। কেননা, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র অচীরেই এক মহামানব হিসেবে আবির্ভূত হবেন।[৪]

অতীতের আসমানী গ্রন্থগুলোও এ সাক্ষ্য প্রদান করে আসছিলো যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বশেষ যে মেসেঞ্জার, মরুর দেশে, আবির্ভূত হবেন তিনি হবেন করুণার আধার, আর তার নাম হবে আহমাদ বা প্রশংসিত (মুহাম্মদ)। যেমনটা বাইবেলে পাওয়া যায় ঃ

I have got many things to say unto you but you cannot bear them now. Howbeit when the spirit of truth, for he shall not speak of himself but when so ever he shall hear that he shall speak and he will show you things to come. He shall glorify me. (Bible, john 16 : 12-14)

৪. সীরাতু ইবনে হিশাম ৪৫-৪৭

www.pathagar.com

এমনি ধরনের আরও তথ্য পাওয়া যায় বার্নাবাস লিখিত সুসমাচারে ঃ আল্লাহর নবী ঈসা (আ)-এর কথাকে তিনি এভাবে উদ্ধৃত করেছেন ঃ

"শুধুমাত্র সত্যই অনন্ত জীবনে ফলদায়ক হয়। আল্লাহ এক, সত্য এক, যার অর্থ এই যে, ধর্ম এক এবং ধর্ম এর অর্থও এক, অতএব ধর্মীয় বিশ্বাসও এক। আমি তোমাদেরকে সত্যই বলছি যে, যদি মূসার গ্রন্থ হতে সত্যকে মুছে ফেলা না হতো আমাদের পিতৃ পুরুষ দাউদকে দ্বিতীয় গ্রন্থ (যাবুর) দান করতেন না। আর যদি দাউদের গ্রন্থ দূষিত না হয়ে যেত আল্লাহ আলেখ্য (ইঞ্জিল)-এর দায়িত্বভার আমার উপর অর্পণ করতেন না। এর কারণ এই যে, আমাদের প্রভু আল্লাহ চিরন্তন এবং সমস্ত মানব জাতিকে তিনি একই বাণী প্রেরণ করেছেন। অতএব আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ যখন আসবেন, তিনি অবিশ্বাসীরা যেই সব জিনিস দ্বারা আমার গ্রন্থকে দূষিত করবে, সেই সকল বিদূরিত করতেই আসবেন।"–(বার্নাবাস লিখিত সুসমাচার ১২৪নং অধ্যায়)

নৈতিকতা বিবর্জিত এক মূর্খ জনগোষ্ঠীর মধ্যে তিনি বড় হচ্ছিলেন। অন্যায়, অবিচার, খুন, রাহাজানি, মদ, জুয়া, ব্যভিচার, প্রতিমা পূজা ইত্যাদি ছিল তাদের নিত্যকর্ম। ধনীরা ছিল গরীবদের প্রভু। মানুষ হিসাবে বাঁচার মতো কোনো অধিকার গরীব তথা দাস শ্রেণীর ছিলো না। এহেন সমাজে নবী মুহাম্মদ (স) বেড়ে উঠছিলেন, অথচ তার চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। কিসের যেন এক অজানা ইশারায় সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী এক মানুষ হিসেবে গড়ে উঠছিলেন তিনি। শৈশব পেরিয়ে যখন তিনি কিশোর, সমাজের এসব অরাজকতা ও নীতিহীনতা দূর করার জন্যে গড়ে তুলেছিলেন এক সংগঠন। ইতিহাসে যা "হিলফুল ফুজুল" নামে খ্যাত। এ সংগঠনের মাধ্যমে তিনি দেশের অশান্তি, দুর্বল ও অসহায়দের উপর শক্তিমানদের যুলুম ইত্যাদি প্রতিহত করার চেষ্টা করতেন। অথচ তিনি তখনো নবী হননি। অতপর চল্লিশ বছর বয়সে সেই মহা দায়িত্ব, যে দায়িত্ব অর্পণের জন্য ছিল এতো আয়োজন তা আল্লাহ অর্পণ করলেন অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী নাযিল হওয়া শুরু হলো। উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা সাধনের প্রক্রিয়াও আরম্ভ হলো এবার। যারা তাকে জানতো অত্যন্ত নিকট থেকে, অহী নাযিলের খবর যখন তাদের কাছে পৌঁছলো। বললো, যদি মুহাম্মদ (স) এটা বলে থাকেন তাহলে আমরা বিনা বাক্যেই ঈমান আনলাম, কেননা এ ব্যক্তি কখনোই মিথ্যা বলতে পারেন না।

অতপর (অহী নাযিলের শুরু থেকে), যে জীবন তার শুরু হলো, দুনিয়ার ইতিহাস তা লিখে রেখেছে। সে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, না, মিথ্যার উপর

www.pathagar.com

এমন বিপ্লব সাধিত হতে পারে না। স্বর্গীয় কোনো GUIDENCE ব্যতিরেকে এমন উন্নত চরিত্রও কোনো মানুষ অর্জন করতে পারে না, এমন অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব কোনো রক্ত মাংসের মানুষ আপনা আপনি লাভ করতে পারে না, নিশ্চিতভাবেই স্বর্গীয় কোনো দূত তার নিকট আসতো। সে ইতিহাস পাঠ আজ কোনো দুষ্প্রাপ্য জিনিস নয়, যে কেউ চাইলেই তা পড়তে পারে। যিনি তার ও তার অনুসারীদের জীবন কাহিনী পড়বেন তিনিই সাক্ষ্য দেবেন যে, না, এহেন ব্যক্তির দ্বারা কোনো মিথ্যা কথা বা কাজ কিছুতেই সম্ভব নয়, এহেন ব্যক্তি কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা বলতে পারেন না।

পাঠক, পাঠিকাদের উদ্দেশ্যে এ মহাপুরুষের জীবন চরিত থেকে মাত্র গুটি কয়েক চিত্র এখানে উদ্ধৃত করলাম ঃ

নবী মুহাম্মদ (স)-এর ক্ষমাশীলতা
তায়েফের প্রান্তরে

এটি নবুয়াতের দশম বছরের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ (স)-এর বয়স তখন পঞ্চাশ। অনেক করুন ঘটনার সাক্ষী নবুয়াতের এ দশটি বছর। ইসলাম গ্রহণকারীদের উপর কাফের সরদারদের সীমাহীন অত্যাচার আর নির্যাতন চরমে উঠেছিল। নিরুপায় হয়ে রাসূল (স) কতককে হিজরত করতে নির্দেশ দিয়েছেন আবিসিনিয়ায়।

ক্রমাগত দশটি বছর অব্যাহত চেষ্টা-প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মক্কার সরদার শ্রেণী ও বেশীর ভাগ লোক রাসূল (স)-এর দাওয়াতে সাড়া দিলো না। বরং তারা আল্লাহর নবীকেই খতম করে দেবার ফন্দি আটতে লাগলো। স্নেহভাজন চাচা আবু তালিবও দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। প্রতিটি আপদে বিপদে যিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর একান্ত সহমর্মী ও সংগীনি, দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে যিনি ধন-সম্পদ আর অনুপ্রেরণা দিয়ে সাহস যুগিয়েছেন সেই খাদিজা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-ও আর জীবিত নেই।

এক্ষণে তিনি এমন একটি আবাসস্থলের সন্ধানে ছিলেন। যেখানে এক আল্লাহর বন্দেগীর ভিত্তিতে একটি নতুন সমাজ গড়ে তুলবেন। এ সময় তিনি তায়েফ নগরীর কথা স্মরণে আনেন। কারণ মক্কার কাছাকাছি এ একটি শহরই আছে। হয়তোবা এখানকার জনগোষ্ঠী এ দাওয়াত কবুল করতেও পারে। এটা ভেবে পালক পুত্র যায়েদ ইবনে হারিছা (রা)-কে সাথে নিয়ে তায়েফের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

www.pathagar.com

কিন্তু হায়, ক্রমাগত দশ বছর ধরে মক্কায় প্রত্যাখ্যাত হয়ে যে শেষ আশা-ভরসা নিয়ে এ জনগোষ্ঠীর কাছে এসেছিলেন, এখানে এসে সে আশা-ভরসা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুখ থেকে নতুন দ্বীনের কথা শুনে বানু সাকীফ গোত্রের এক সরদার বললো ঃ

"আল্লাহ রাসূল বানাবার মতো তোমাকে ছাড়া আর কাউকে পেলেন না, যার পক্ষে বাহন হিসাবে একটি গাধা পর্যন্তও যোগাড় করা সম্ভব হয়নি ?"

আর এক সরদার বললো ঃ

"আল্লাহ যদি তোমাকে রাসূল বানিয়ে থাকেন, তাহলে কা'বার গিলাফ ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে" (অর্থাৎ কাফের সরদারের মতে মুহাম্মদ (স)-এর মত একজন নিঃস্ব লোককে রাসূল করে বানানোর কারণে কা'বার মর্যাদা বিনষ্ট হয়েছে। কেননা তার ধারণায় এমন একজন গরীব অসহায় লোককে রাসূল করা অযৌক্তিক)।

আর এক সরদার বললো ঃ

"আমি তোমার সাথে কখনই কথা বলবো না। কেননা তুমি যদি সত্যই আল্লাহর রাসূল হয়ে থাক, তাহলে তো আমি তোমার সাথে কথা বলারই যোগ্য নই। আর যদি না-ই হয়ে থাক তাহলে মিথ্যুকের সাথে কথা বলাই আমার জন্য অপমানকর।"

রাসূলুল্লাহ (স) আর কোনো কথা না বলে ভাঙ্গা মন নিয়ে উঠে আসলেন। মক্কা অভিমুখে রওনা করবেন কিন্তু দুরাত্মা কাফের সরদারগণ তাঁকে নির্বিঘ্নে তায়েফ ত্যাগ করতে দিলো না। তারা তায়েফের গুণ্ডা, বখাটে ও দাস শ্রেণীর লোকদেরকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পেছনে লেলিয়ে দিলো এই বলে যে, এ লোক পাগল, একে ঢিল ছুড়ে শহর থেকে বের করে দাও।

আদেশ পেয়েই তারা হৈ হল্লা করতে করতে চারদিক থেকে ছুটে এলো এবং পাথর নিক্ষেপ করতে লাগলো, এভাবে তারা পাথর নিক্ষেপ করতে করতে পিছন পিছন এলো যতক্ষণ না রাসূল (স) শহরের বাইরে এসে একটা বাগানে আশ্রয় নিলেন। তখনকার এ দৃশ্য দেখে কলিজা দীর্ণ হয় না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া ভার। সঙ্গী যায়েদ বিন হারিসা (রা) রাসূল (স)-এর পাদুকা খুলতে চেষ্টা করলেন। দেখা গেল শরীর থেকে রক্ত ঝরতে ঝরতে পাদুকা পায়ের সাথে জমাট বেঁধে লেগে আছে।

www.pathagar.com

আগুনে ঝাপ দিতে উদ্যত লোক সকলকে তিনি কোমর ধরে বাঁচাতে চেষ্টা করছিলেন অথচ সেই লোকগুলোই রাসূলুল্লাহ (স)-এর কোমর ভেঙ্গে দিলো। বড় আজব এ দুনিয়া।

যা হোক, একটু শান্ত হয়ে এবার রাসূল (স) আল্লাহর কাছে দোয়া করছেনঃ

"হে আল্লাহ! আমার দুর্বলতা, অক্ষমতা, সহায় সম্বল ও বিচক্ষণতার অভাব এবং মানুষের কাছে আমার নগণ্যতা ও অবজ্ঞা-উপেক্ষার জন্য আপনারই কাছে আমি ফরিয়াদ করছি। হে শ্রেষ্ঠ দয়াবান! আপনি দুর্বল ও উপেক্ষিতদের প্রতিপালক। আপনি আমারও প্রতিপালক। কার দয়া ও করুণার উপর আমাকে ছেড়ে দিচ্ছেন ? আমার সাথে যে নিষ্ঠুর আচরণ করে সেই অনাত্মীয়ের উপর না কি সেই শত্রুর যে আমার উপর প্রভাবশালী ও পরাক্রান্ত হয়ে উঠেছে ? আমার উপর আপনি যদি স্বস্তি ও নিরাপত্তা দান করেন তবে সেটা আমার জন্য নিসন্দেহে স্বস্তির কারণ।

আমি আপনার সেই আলোর আশ্রয় চাই, যার আর্বিভাবে সকল অন্ধকার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সকল সমস্যার সুরাহা হয়। আপনার সকল ভর্ৎসনা মাথা পেতে নিতে আমি প্রস্তুত। আপনার সাহায্য ছাড়া আর কোনো উপায়ে শক্তি-সামর্থ লাভ সম্ভব নয়।" রাসূলুল্লাহ (স)-এর সফর সঙ্গী যায়েদ (রা) এ দোয়া শুনে নিবেদন করলেন এ যালেমদের বিরুদ্ধে আপনি বদদোয়া করুন। রহমতের নবী (স) বলে উঠলেন ঃ "আমি ওদের জন্য বদদোয়া করবো কেন। ওরা যদি ঈমান নাও আনে তবু আমি এ আশা তো রাখি যে, ওদের বংশধরগণ একদিন অবশ্যই ঈমান আনবে।"

রাসূল (স) বাগান হতে বের হয়ে মক্কা পানে পা বাড়িয়েছেন। হারাম শরীফের সীমায় (যেখান থেকে ইহরাম বেঁধে অগ্রসর হতে হয়) পৌঁছে গিয়েছেন এমন সময় জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এসে নিবেদন করলেন, আপনার দাওয়াতের যে জবাব আপনার কাওম দিয়েছে আল্লাহ সে সকল কিছুই শুনেছেন এবং যে ব্যবহার তারা করেছে তাও আল্লাহ দেখেছেন। হে মুহাম্মদ (স)! আল্লাহ আপনার নিকট এ পর্বতমালার পরিচালক ফেরেশতাকে পাঠিয়েছেন। আপনি যাকিছু চান একে তা করার নির্দেশ দিন। হে মুহাম্মদ! আপনার পূর্ণ ইখতিয়ার রয়েছে। আপনি যদি নির্দেশ করেন তাহলে দু'টি পাহাড়কে উপরে তুলে তায়েফ নগরীকে নিষ্পেষিত ও চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়া হবে।

প্রিয় পাঠক, লক্ষ্য করুন, পাথর মেরে আঘাতে আঘাতে যাকে রক্তাক্ত করে দেয়া হয়েছে তিনি এখন প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা পেয়েও কি জবাব দিচ্ছেন।

www.pathagar.com

তিনি বলছেন, "এ লোকদের প্রতি আমি তো নিরাশ নই, এদেরই বংশে আল্লাহর এমন সব বান্দা বেরিয়ে আসবে যারা এক মহান আল্লাহর বন্দেগী করবে, তার সাথে কাউকে শরীক করবে না। কাউকেই তার সমতুল্য বা প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে গ্রহণ করবে না।"

কোনো মিথ্যাবাদীর চরিত্র কি এমন উদার হতে পারে ?

নবী মুহাম্মদ (স)-এর উদারতা
মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে

এটি অষ্টম হিজরীর কথা অর্থাৎ নবুয়াতের ২১তম বছরের ঘটনা। রাসূল (স)-এর বয়স তখন ৬১ বছর। নবুয়াতের এ দীর্ঘ ২১ বছরে অনেক কিছুই ঘটেছে। পাঠক সেসব ইতিহাস রাসূলুল্লাহ (স)-এর সীরাত অধ্যায়ে পড়তে পারবেন। আমি শুধু মক্কা বিজয়ের শেষ মুহূর্তের খানিক ইতিহাস এখানে বর্ণনা করবো।

দশ হাজার সশস্ত্র মুসলিম মুজাহিদ নিয়ে আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (স) মক্কা অভিযানে চলেছেন। এ সেই জন্মভূমি মক্কা, দীর্ঘ ২১ বছর পূর্বে অত্যাচারে নিপীড়নে অতিষ্ট হয়ে যেখান থেকে তিনি হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন, এই সেই মক্কা যে জনপদের অধিবাসীরা আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (স)-কে হত্যার পরিকল্পনা করেছিলো, এ সেই মক্কা যে নগরের সরদারবৃন্দ রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীদেরকে একমাত্র ইসলাম গ্রহণের অপরাধে জলন্ত অংগারের উপর শুইয়ে অতপর তার উপর পাথর চাপা দিয়ে রাখতো।

সিরাত ও হাদীস গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে ঃ আল্লাহর অনুগ্রহের ফলে মুসলিম বাহিনী যে বিজয় লাভ করতে চলেছে তার জন্য রাসূল (স) মক্কার কাছাকাছি পৌঁছেই মাথা নীচু করে চলছিলেন। আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তিনি মাথা এতটা নীচু করে অগ্রসর হচ্ছিলেন যে, তার দাঁড়ি উটের দেহ স্পর্শ করছিলো। তার প্রতিটি পদক্ষেপ আর আচরণে প্রকাশ পাচ্ছিলো যে, এ বিজয়ের সমস্ত কৃতিত্ব একমাত্র আল্লাহর, কোনো মানুষের নয় এবং সমস্ত অহংকার আর বড়ত্বও একমাত্র আল্লাহরই।

বিজয়ী দল যেখানে বরাবরই প্রতিশোধ স্পৃহা আর ভোগের উম্মাদনা নিয়ে বিজিতের উপর চড়াও হয়, এ দল ছিল এসবের সম্পূর্ণ বিপরীত।

মক্কাবাসী ভয়ে ছিল সন্ত্রস্ত, যে মুহাম্মদকে তারা নিপীড়নে-নির্যাতনে অতিষ্ঠ করে অবশেষে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল সে মুহাম্মদ আজ বিজয়ীর বেশে মক্কাপানে অগ্রসরমান। আবু সুফিয়ান ঘোষণা করছিলো, "হে কুরাইশগণ!

www.pathagar.com

মুহাম্মদ এমন এক বাহিনী নিয়ে এসেছে যার মুকাবিলা করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। এখন আবু সুফিয়ানের বাড়ীতে যে আশ্রয় নেবে তার কোনো ভয় নেই।"

এ সময় উতবার কন্যা হিন্দা আবু সুফিয়ানের কাছে গিয়ে তার গোঁফ টেনে ধরে বললো, হে কুরাইশগণ! এই মোটা পেটুককে হত্যা করো। জাতির নেতৃত্বের মর্যাদায় থেকে সে কলংকিত হয়েছে।" আবু সুফিয়ান বললো, তোমাদের বিপর্যয় সম্পর্কে সাবধান হও। এ মহিলার কথায় বিপথগামী হয়ো না। তোমাদের উপর এক অপ্রতিরোধ্য বাহিনী সমাগত। এমতবস্থায় আমার বাড়ীতে যে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ থাকবে।"

সবাই বললো, তোর উপর অভিসম্পাত ! তোর বাড়ী আমাদের কি কাজে আসবে ?"

ইবনু ইসহাক লিখেছেন–

"রাসূলুল্লাহ (স) মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং লোকজন শান্ত হলে তিনি কা'বা শরীফে গিয়ে তাওয়াফ করলেন। অতপর উসমান ইবনে তালহাকে ডেকে তার নিকট থেকে কাবার চাবি নিলেন। দরজা খুলে দেয়া হলে তিনি কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। সেখানে মালাইকা (ফেরেশতা) ও অন্যান্য অনেক কিছুর প্রতিকৃতি ছিলো, এক মূর্তির হাতে ছিল কিছু তীর, এ মূর্তিকে তারা নবী ইবরাহীম আলাইহিস সালাম হিসেবে গণ্য করতো। এসব দেখে মুহাম্মদ (স) বললেন, "আল্লাহর অভিশাপ হোক মুশরিকদের উপর। আমাদের প্রবীণতম মুরব্বীকে তারা ভালমন্দ নির্ধারণের তীর বানিয়ে ছেড়েছে। কোথায় ইবরাহীম আর কোথায় এসব !"

অতপর ঐসব সমুদয় প্রতিকৃতি বিনষ্ট করে তিনি কা'বার দরজায় দাঁড়িয়ে নিম্নরূপ ভাষণ দিলেন ঃ

"আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক ও লা-শরীক। তিনি তার ওয়াদা পালন করেছেন, স্বীয় বান্দাকে বিজয়ী করেছেন এবং কাফেরদের সংগঠিত দলগুলোকে পরাস্ত করেছেন। শুনে রাখ অতীতের যে কোনো রক্ত, সম্পদ বা অর্থের দাবী (অবৈধ) আমার এ পায়ের তলায় দলিত করলাম। হে কুরাইশরা! তোমাদের জাহিলিয়াতের সমুদয় আভিজাত্য, অহংকার, বংশ কৌলিণ্য এবং পূর্বপুরুষদের নামে বড়াই করার সমস্ত প্রথা আল্লাহ রহিত করে দিয়েছেন। সকল মানুষ আদমের সন্তান এবং আদম মাটির তৈরী।" অতপর তিনি কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ

www.pathagar.com

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا ط

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ط -(الحجرت : ١٣)

"হে মানব জাতি ! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও স্ত্রী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। আসলে তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী খোদাভীরু সেই আল্লাহর কাছে সবচেয়ে সম্মানীত।"

-(সূরা হুজুরাত ঃ ১৩)

অতপর তিনি সকলকে উদ্দেশ করে জিজ্ঞেস করলেন—হে কুরাইশগণ, তোমরা আমার নিকট আজ কি ধরনের আচরণ প্রত্যাশা করো ? সবাই বললো, উত্তম আচরণ, কেননা তুমি আমাদের এক মহান ভ্রাতা এবং এক মহান ভ্রাতার পুত্র।

রাসূল (স) বললেন—"যাও, তোমরা সকলে মুক্ত ও স্বাধীন।"

এভাবে মানবতার নবী মুহাম্মদ (স) মহত্বের এমন এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন দুনিয়ার ইতিহাসে কোনো রক্ত মাংশের মানুষ যা দেখাতে পারেনি।

স্বর্গীয় কোনো GUIDENCE ব্যতিরেকে মাটির পৃথিবীতে, মাটির মানুষের মধ্যে এমন ধরনের উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কখনোই পয়দা হতে পারে না। শান্তি ও সাম্যের যে মূলনীতি তিনি ভাষণের মাধ্যমে পেশ করেছেন এসব মূলনীতিও কদাপি কোনো সাধারণ মানুষের চেতনায় আসতে পারে না।

মুহাম্মদ (স)-এর দারিদ্রসুলভ জীবনযাত্রা

ইউরোপীয় লেখকগণ, যাদের নিকট মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য স্পষ্ট নয়, তারা মনে করেন—মুহাম্মদ (স) আর দশজন সমাজ সংস্কারকের মতই একজন মহান সংস্কারক ছিলেন এবং তাদের অনেকে এমনও বলে থাকেন যে, বিপ্লবে সাকসেসফুল হওয়ার পর মুহাম্মদ আর দশজন নেতার মতই নেতা ও বাদশাহ বনে গিয়েছিলেন।

অথচ সত্য ইতিহাস হচ্ছে এই যে, সমগ্র আরব পদানত হওয়ার পরও তিনি উপোষ করেই দিন কাটাতেন। সহীহ আল বুখারীর জিহাদ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে—মৃত্যুর সময়ও তার বর্মখানা এক ইয়াহুদীর নিকট বন্ধক ছিল মাত্র তিন সা' যবের বিনিময়ে। যে কাপড় পরিধান করে তিনি মৃত্যুবরণ করেন এগুলোর উপর এবং নীচে তালি লাগানো ছিলো, অথচ সে সময় সমগ্র আরব

www.pathagar.com

বিজিত হয়েছিল এবং মদীনার অধিবাসীদের মধ্যে স্বাচ্ছন্দ ও আর্থিক প্রাচুর্য বিরাজ করছিলো।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত— "মদীনায় অবস্থানের শুরু হতে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি পূর্ণ তৃপ্তিসহ দু' বেলা রুটি আহার করতে পারেননি।[৫]

ওমর আল ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন "আমি একবার রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে হাজির হলাম। ঘরে প্রবেশ করে রাসূলুল্লাহর আসবাবপত্র যা প্রত্যক্ষ করলাম তা ছিলো এই ঃ দেহ মুবারকের উপর একটি চাদর, একটি খোলা চার পায়া, শিথানে একটি বালিশ যার উপর খোরমা খেজুরের পাতা ছড়িয়ে রয়েছে। একদিকে এক মুঠি যব রাখা আছে। এক কোণে পায়ের নিকট কোনো জন্তুর চামড়া পড়ে আছে, পানির মশকের কয়েকটি চামড়া খুটির সাথে লটকানো রয়েছে।

ওমর (রা) বলেন—এসব দেখে আমার দু' চোখ ভরে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে লাগলো। রাসূল (স) আমার কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে আমি বললাম, হে রাসূল (স) আমি কেন কাঁদবো না। চার পায়ার শক্ত রশির চিহ্নগুলো গভীর হয়ে আপনার দেহে বসে গেছে। আপনার দ্রব্যসামগ্রীর করুণ অবস্থা ঘরের চারদিকে দেখা যাচ্ছে। কাইসার (রোম সাম্রাট) ও কিসরা (পারস্য) তো সুরমাবাগ-বাগীচার আয়েশ লুটছে আর আল্লাহর রাসূল, তার সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি হয়েও আপনার গৃহ সামগ্রীর এ দরিদ্র অবস্থা।

একথা শুনে রাসূল (স) বললেন, হে খাত্তাব পুত্র, ওরা দুনিয়ার সুখ ভোগ করুক, আর আমরা পরকালীন সুখের অধিকারী হই তা কি তুমি পসন্দ করো না।[৬]

আদর্শ বিচারক

ইসলাম তখন একটি বিজয়ী আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (স) তখন সে আদর্শ রাষ্ট্রের কর্ণধার। এ সময় মাখযুম বংশীয়া এক মহিলা চুরি করে ধরা পড়ে যায়। চুরির শাস্তি স্বরূপ হাত কাটা যাবে এটা সকলের জানা ছিলো। কিন্তু এ অভিজাত বংশীয়া মহিলার হাত কাটা যাওয়া অত্যন্ত লজ্জাকর ও অপমানজনক ব্যাপার মনে করে কুরাইশ বংশের নেতৃস্থানীয় লোকেরা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তারা সকলে মিলে ঠিক করলেন যে, এ শাস্তি

৫. তিরমিযী
৬. মুসলিম, তিরমিযী।
৫—

www.pathagar.com

যাতে কার্যকর না হয় সে জন্য রাসূল (স)-এর প্রিয় পাত্র উসামা বিন যায়েদ রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট সুপারিশ করবেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) বলেন—"উসামা বিন যায়েদ অতপর রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট মেয়েলোকটি সম্পর্কে সুপারিশ করলেন। সুপারিশ শুনে রাসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ আল্লাহর অনুশাসন কার্যকর করার ব্যাপারে তুমি আমার নিকট সুপারিশ করতে এসেছ ? অতপর তিনি জনতাকে সমবেত করে বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ শুধু এজন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের মধ্যে কোনো ধনী বা অভিজাত বংশীয় লোক যদি চুরি করতো তাহলে তাকে ছেড়ে দিতো। কিন্তু যদি কোনো দুর্বল ব্যক্তি চুরি করতো তবে তার উপর আইনের শাসন কার্যকর করতো। আল্লাহর শপথ ! মুহাম্মদের মেয়ে ফাতেমাও যদি চুরি করতো তাহলে তার হাতও কাটা হতো।[৭]

অধীনস্ত ও শ্রমিকের অধিকার আদায়ে নবী মুহাম্মদ (স)

সকল মিথ্যা আভিজাত্য বোধের উপর কুঠারাঘাত হেনে আল্লাহর নবী (স) ঘোষণা করেছিলেন—সকল মানুষ আল্লাহর বান্দা ও এক আদমের সন্তান। আল্লাহর নিকট ধনী, দরিদ্র, উঁচু, নীচু, মনিব, চাকর, রাজা, প্রজা, সকলে সমান। মানুষের মধ্যে পার্থক্য হবে কেবলমাত্র সৎকর্মে। যে লোক অধিক সৎ ও আল্লাহভীরু কেবলমাত্র সে-ই অধিক সম্মান পাবার অধিকারী। অধীনস্তদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (স) সারা জীবন যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা দুনিয়ার ইতিহাসে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। তার কয়েকটি হাদীস মাত্র নীচে তুলে ধরা হলো ঃ "তোমাদের অধীনস্তরা তোমাদের ভাই, তোমরা নিজে যা খাবে তাদেরকেও তা খাওয়াবে, তোমরা নিজেরা যা পরিধান করবে তাদেরকে তা পরিধান করাবে।"

তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তাদের স্ব-স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নেতা (সমাজের ছোট গণ্ডী থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদ পর্যন্ত) তার অধীনস্তদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল এবং এ দায়িত্ব সম্পর্কে সে জিজ্ঞাসিত হবে, পরিবারের কর্তা বা অভিভাবক পরিবারের সকল সদস্যদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল এবং এ দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জবাবদিহি করতে হবে, স্ত্রী তার স্বামীর ঘর-সংসারের ব্যাপারে দায়িত্বশীল এবং এ ব্যাপারে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। খাদেম বা চাকর তার মনিবের মাল-সম্পদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল এবং এ ব্যাপারে তাকে জবাবদিহি করতে হবে এবং

৭. বুখারী, মুসলিম।

www.pathagar.com

তোমাদের প্রতিটি ব্যক্তিকেই তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে।[৮]

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আরজ করলো, হে রাসূলুল্লাহ (স) আমি কতবার চাকর চাকরাণীদের অপরাধ ক্ষমা করবো ? তিনি নিশ্চুপ রইলেন। পুনরায় সে একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলো, রাসূলুল্লাহ (স) এবারও নিশ্চুপ রইলেন। সে তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলে রাসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ দৈনিক সত্তরবার ক্ষমা কর।[৯] অধীনস্তদের অধিকার আদায়ে নবী মুহাম্মদ (স)-এর অনুভূতি ও দায়িত্বসচেতনতার আরও পরিচয় পাওয়া যায় তার অন্তিম সময়ে উচ্চারিত বাণীতে। আলী ইবনে আবু তালেব (রা) থেকে বর্ণিত, "মৃত্যুর সময় আল্লাহর রাসূল (স) আমাদেরকে যে সর্বশেষ নসিহত দান করেন তা ছিলো এই নামায, নামায। আর তোমাদের অধীনস্তদের অধিকার ভুলে যেয়ো না।[১০]

নিঃস্ব নিপীড়িতদের প্রতি মুহাম্মদ (স)

হারিসা বিন ওয়াহ্হাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) একদিন আমাদের উদ্দেশ করে বললেন, কোন্ ধরনের লোক জান্নাতের অধিবাসী হবে তা কি আমি তোমাদের বলবো না ? প্রতিটি দুর্বল, গরীব ও মাযলুম, যাকে লোকেরা তুচ্ছ জ্ঞান করে। যদি সে আল্লাহর উপর ভরসা করে শপথ করে তাহলে আল্লাহ তা পূর্ণ করেন। কেমন ধরনের লোক জাহান্নামে যাবে আমি কি তোমাদের অবহিত করবো না ? প্রতিটি হিংস্র স্বভাব, উদ্ধত, অহংকারী লোক জাহান্নামে যাবে।[১১]

নিঃস্ব নিপীড়িতদের দরদী নবী (স) আরও বলে গেছেন—

"এমন অনেক লোক আছে যাদের মাথার চুল উসকু খুসকো এবং পা ধূলি-ধূসরিত, তাদেরকে মানুষের দরজাসমূহ থেকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়া হয়। অথচ তারা যদি আল্লাহর নামে শপথ করে তাহলে আল্লাহ তাদের শপথকে বাস্তবায়িত করে দেন।"[১২]

ইয়াতীমদের প্রতি আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (স)

ইয়াতীমদের অভিভাবক ছিলেন মুহাম্মদ (স)। তিনি নিজে যেমন এ অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছেন তদ্রূপ ইসলামী উম্মাতকেও এ ব্যাপারে অগ্রণী হওয়ার জন্য জোর তাকিদ দিয়েছেন।

---

৮. বুখারী, মুসলিম, ৯. আবু দাউদ, ১০. ইবনে মাযা, ১১. বুখারী ও মুসলিম, ১২. মুসলিম।

www.pathagar.com

রাসূল (স) থেকে বর্ণিত—

"আমি এবং ইয়াতীমের ভরণ পোষণকারী জান্নাতে এভাবে থাকবো" এটা বলে তিনি দু' হাতের দু' আঙ্গুল পাশাপাশি একত্র করে দেখালেন।[১৩]

তিনি আরও বলে গেছেন—

"গরীব বিধবা এবং নিঃস্ব মিসকীনদের প্রয়োজনে শ্রমদানকারী ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদকারী মুজাহিদের মতোই।[১৪]

আল্লাহর রাসূল (স) আরও বলতেন—

"সবচেয়ে নিকৃষ্ট খাদ্য ঐ ওয়ালীমার খাদ্য যাতে শুধু ধনীদেরকে দাওয়াত করা হয় আর গরীবদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হয়।"

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন—"একদিন দু'টি বালিকা নিয়ে আমার নিকট একজন মহিলা এলো, তারা খাবার চাইছিলো। কিন্তু আমার নিকট তখন একটি মাত্র খেজুর ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। আমি তা-ই মহিলাটিকে দিলাম। মহিলাটি খেজুরটি দু' ভাগ করে তার মেয়ে দু'টিকে দিলো কিন্তু নিজে কিছুই খেলো না অথচ সেও ক্ষুধার্ত ছিলো। তারা চলে গেলে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আমি এ ঘটনা বর্ণনা করলাম। শুনে রাসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ মেয়ে সন্তান দিয়ে আল্লাহ যাকে পরীক্ষায় ফেলেছেন, অতপর সে যদি এসব মেয়েকে উত্তমভাবে লালন পালন করে তাহলে এসব মেয়েরাই তার এবং জাহান্নামের আগুনের মধ্যে পর্দা (আবরণ বা বেষ্টনী) হয়ে দাঁড়াবে।"[১৫]

মানবতার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লেখাপড়া জানতেন না। বুদ্ধি, মননশীলতা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্যে যে পরিবেশ ও শিক্ষার প্রয়োজন এসবের কোনোটাই সে যুগে ছিলো না। অথচ অবাক ব্যাপার, তার ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি, মননশীলতা, উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও উন্নত নৈতিকতার জন্য তিনি ইতিহাসের সকল গুরুদের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা গুরুরূপে পরিগণিত। মাইকেল এইচ, হার্ট রচিত THE HUNDRED বই এর জলন্ত প্রমাণ। অথচ তিনি মুসলিম নন এবং মুহাম্মদ (স)-এর নাম এক নম্বরে লিখতে তাকে কেউ বাধ্যও করেনি।

মানবতার শ্রেষ্ঠ এ শিক্ষাগুরু সারা জীবন ধরে যে দৃষ্টান্তসমূহ রেখে গেছেন তা ইতিহাসের পাতায় জ্বল জ্বল করছে। নীচে সে সবের গুটিকয়েক মাত্র উদ্ধৃত হলো ঃ

---

১৩. বুখারী, ১৪. বুখারী ও মুসলিম, ১৫. বুখারী ও মুসলিম।)

www.pathagar.com

"রাসূল (স) মসজিদে বসে আছেন তার কয়েকজন সাহাবী নিয়ে। এমন সময় এক আরব বেদুইন উপস্থিত হলো। তার প্রশ্রাবের বেগ আসলে মসজিদে দাঁড়িয়েই সে প্রশ্রাব শুরু করে দিলো। লোকেরা দৌড়ে গিয়ে বেদুইনকে মসজিদ থেকে তাড়িয়ে দিতে চাইলো, কিছু উত্তম মধ্যমও দেয়ার উপক্রম। আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (স) বলে উঠলেন—লোকটিকে ছেড়ে দাও। অর্থাৎ তার তাৎক্ষণিক প্রয়োজনতো পূরণ হয়ে যাক। তার প্রশ্রাব শেষ হলে রাসূল (স) তাকে নিজের নিকট ডেকে স্নেহভরে বোঝালেন মসজিদ একটি পবিত্র স্থান, এটি সিজদার জায়গা। এখানে প্রশ্রাব করা নিষেধ।

অতপর তিনি সাবাহীদের উদ্দেশ করে বললেন, প্রশ্রাবের উপর এক মশক পানি ঢেলে স্থানটি পাক-সাফ করে দাও। আল্লাহ তো তোমাদের নম্র ও নরম বানাতে চান, কঠোর ও নির্দয় হৃদয় নয়।"[১৬]

মানব সন্তানের স্বভাবজাত প্রকৃতি ও তার উপর শিক্ষার প্রভাব সম্পর্কে নিরক্ষর এ নবী (স) যে বাণী উচ্চারণ করে গেছেন তা সে যুগের মানুষদের জন্য ছিল একেবারেই অকল্পনীয়।

তিনি বলে গেছেন ঃ

"প্রতিটি শিশুই তার ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে অতপর তার বাপ, মা-ই ইয়াহুদী, কিংবা খৃষ্টান বা অগ্নিপূজক বানিয়ে দেয়।"[১৭]

দয়া ও করুণা অবলম্বন এবং কঠোরতা পরিহার

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে অভিযোগ করলো যে, মুয়ায বিন জাবাল (রা) নামাযে লম্বা সূরা পাঠ করেন যার ফলে নামায আদায় করতে তিনি অসমর্থ বোধ করছেন। আবু মাসউদ আনসারী (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে কখনো এতবেশী রাগান্বিত হতে দেখিনি যতখানি সেবার দেখেছি। তিনি লোকজনদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, কোনো কোনো লোক এমনও আছে যে, মানুষকে তারা আল্লাহর দ্বীনের প্রতি বিরাগভাজন করে তোলে। তোমরা শুনে রাখ তোমাদের মধ্যে যারাই নামাজ পড়াবে (অর্থাৎ ইমাম হবে) তারা যেন সংক্ষেপে তা সম্পন্ন করে। কেননা নামাযে বৃদ্ধ, কমজোর এবং শ্রমিকরাও শরীক থাকে।[১৮]

আরও দেখা যায়—

"একবার এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল (স) আমি বরবাদ হয়ে গেছি। রোযার মাসে, রোযা রেখে

১৬. বুখারী, মুসলিম ১৭. বুখারী, ১৮. বুখারী।

www.pathagar.com

আমি স্ত্রী সহবাস করে ফেলেছি। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন—একটি ক্রীতদাস মুক্ত করে দাও। সে বললো—আমি তো অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তি ক্রীতদাস কোথা পাব ? রাসূল (স) বললেন, দু' মাসের রোযা রাখো একাধারে। বললো—তা তো আমার দ্বারা সম্ভব নয়। রাসূল (স) বললেন, ষাটজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াও। সে বললো, এটা করার আর্থিক সামর্থও আমার নেই। রাসূলুল্লাহ চিন্তায় মগ্ন হলেন। ঘটনাক্রমে এ সময়ে কোনো জায়গা থেকে এক টুকরী বোঝাই খেজুর রাসূল (স)-এর নিকট পাঠানো হলো। রাসূল (স) বললেন—এ খেজুর নিয়ে গরীবদেরকে খাইয়ে দাও। লোকটি বললো, যে আল্লাহ আপনাকে রাসূল বানিয়েছেন তার নামে শপথ করে বলছি, সমগ্র মদীনায় আমার অপেক্ষা বড় গরীব লোক আর কেউ নেই। রাসূলুল্লাহ (স) এবার হেসে উঠলেন। বললেন, ঠিক আছে তুমিই এগুলো খেয়ে ফেল।[১৯]

মুহাম্মদ (স)-এর বিনয় ও নম্রতা

অহংকার ও অহমিকাবোধ মানুষের মধ্যে একটি শয়তানি প্রবৃত্তি। শয়তান আদম সন্তানদের মধ্যে নেতা, শাসক বা প্রভাবশালী ব্যক্তিকে পথভ্রষ্ট করতে চাইলে প্রথম যে অস্ত্রটি প্রয়োগ করে তা হচ্ছে এটি। পৃথিবীর ইতিহাস অধ্যয়ন করলে এ সত্যই স্পষ্ট হয়ে উঠে। ধর্ম যেখানে বা যে সমাজে অনুপস্থিত ছিল সেখানেই দেখা গেছে সমাজের নেতা, শাসক আর প্রভাবশালীরা মানুষের প্রভু হয়ে বসেছে।

বস্তুত এক আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ব্যতিরেকে কোনো আদম সন্তান কখনোই এ অসৎ গুণ থেকে বাঁচতে পারে না। আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (স)-এর যখন বিজয় সূচিত হতে লাগলো, লাখ লাখ লোক যখন তার অনুসরণ করতে লাগলো তখন স্বাভাবিকভাবেই তার মধ্যে অহমিকা বা বড়ত্ববোধ দেখা দিতে পারতো যেমনটা দুনিয়ার আর সাধারণ নেতারা করে থাকে। কিন্তু নবী মুহাম্মদ (স)-এর জীবনেতিহাস পাঠ করলে আমরা দেখি নিরহংকার আর বিনয়ের মূর্তপ্রতীক ছিলেন তিনি। যা থেকে প্রমাণিত হয় তিনি দুনিয়ার আর সাধারণ নেতাদের মত নেতা ছিলেন না বরং ছিলেন আল্লাহর প্রেরিত পয়গাম্বর।

নীচে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিনয়, নম্রতার দু' একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো।

"রাসূলুল্লাহ (স) একবার গৃহ হতে বের হলেন। লোকজন তার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে গেল। এটা দেখে রাসূল বললেন, অনারবদের প্রথা অনুসারে তোমরা কারোর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ো না।[২০]

১৯. বুখারী. ২০. আবু দাউদ, ইবনে মাযা।

www.pathagar.com

"একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে সাক্ষাত করতে এলো। সে ভয়ে কাঁপছিল (উল্লেখ্য এটি ইসলামের বিজয় যুগের ঘটনা)। রাসূল (স) তার অবস্থা দেখে বললেন—ভয় করো না আমি বাদশাহ নই। এক কুরাইশী মহিলার সন্তান, যিনি শুকনো গোশত রান্না করে খেতেন।"২১

রাসূল (স)-এর মধ্যে বিনয় এতই প্রবল ছিল যে, নিজের সম্পর্কে বৈধ সম্মানসূচক শব্দাবলীও পসন্দ করতেন না। একবার একলোক এ শব্দাবলী দ্বারা তাকে সম্বোধন করলো, হে আমাদের পরিচালক, আমাদের পরিচালকের সন্তান! হে আমাদের মাঝে সর্বোত্তম এবং আমাদের সর্বোত্তম লোকের সন্তান।

এসব শুনে আল্লাহর রাসূল (স) বললেন—হে লোক সকল তোমরা পরহেজগারী অবলম্বন কর, শয়তান তোমাদেরকে পদস্খলিত করতে পারবে না। আমি আবদুল্লাহর ছেলে মুহাম্মদ। আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আমাকে আল্লাহ যে মর্যাদা প্রদান করেছেন, আমি পসন্দ করি না যে, তোমরা এর চেয়ে বাড়িয়ে বলো।"২২

একবার রাসূল (স) অজু করছিলেন। অজুর পানি হস্তদ্বয়, মুখমণ্ডল থেকে গড়িয়ে পড়ছিল সাহাবীগণ বরকতের নিয়তে নিজেদের শরীরে নিয়ে তা মাখছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এমন করছো কেন ? তাঁরা উত্তর দিলেন, আল্লাহ ও তার রাসূলের মুহাব্বাতে। তখন রাসূল (স) জবাব দিলেন যদি কেউ এ কথায় আনন্দ বোধ করে যে, সে আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে মুহাব্বাত রাখছে তবে তার উচিত কথা বলার সময় সত্য কথা বলা এবং গচ্ছিত আমানত যথাযথভাবে আদায় করা এবং কারোর প্রতিবেশী থাকলে তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা।২৩

সেনাপতি মুহাম্মদ (স)

যে কারণে অতীতের নবী ও রাসূলদেরকে কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছে ঠিক সেই একই কারণে সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ (স)-কেও কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছে। নবুয়াত লাভের পর তিনি সর্বমোট ২৮টি যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেন এবং সেনানায়ক হিসেবে নেতৃত্ব দেন। এর মধ্যে ১৯টি যুদ্ধে কুফরী শক্তি ভীত হয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে, ফলশ্রুতিতে এ ১৯টি যুদ্ধ কোনোরূপ রক্তপাত ছাড়াই সমাপ্ত হয়। বাকী ৯টি যুদ্ধে সামনা সামনি সংঘর্ষ ও কিতাল সংঘটিত হয়।

২১. মুসতাদরাকে হাকিম, সীরাতুন্নবী ২য় খণড, ২২. মুসনাদ ইবনে হাম্বল, ২৩. বায়হাকী, মিশকাত

www.pathagar.com

দুনিয়ার রাজা, বাদশাহ কিংবা সাম্রাজ্য পিয়াসীগণ সাধারণত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন প্রতিশোধ গ্রহণ, সাম্রাজ্য বিস্তার, যশ লাভ কিংবা অন্য কোনো দুনিয়াবী স্বার্থলাভের জন্য। কিন্তু নবী ও রাসূলগণের যুদ্ধের কারণ এসব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেহেতু নবী ও রাসূলগণের আগমনই ঘটে সংস্কারক এবং অন্যায় ও অসত্যের নির্মূলকারী হিসেবে সেহেতু তাদের যুদ্ধের কারণও ঐ একটিই, আর তা হচ্ছে দুনিয়া থেকে যাবতীয় মন্দের উৎখাত করে ভালোর প্রতিষ্ঠা। কি কারণ এবং উদ্দেশ্যে নবী-রাসূলগণ ও তাদের অনুসারীরা যুদ্ধ করেন তার কিছু নমুনাও পেশ করেছে কুরআন ঃ

وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ج وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ج وَّاجْعَلْ لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ○ (النساء : ٧٥)

"তোমাদের কি হলো ! তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই করছো না ? অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বলছে—হে আমাদের রব, আমাদেরকে এ অত্যাচারী শাসকের কর্তৃত্বাধীন জনপদ থেকে বের করে নাও। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন বন্ধু পাঠাও, একজন সাহায্যকারী পাঠাও।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৭৫)

কুরআন আরও ঘোষণা করছে—

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لاَتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ـ(الانفال : ٣٩)

"তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যতদিন না সমুদয় অন্যায়, অশান্তি আর ফেতনা বিদূরিত হয়ে আল্লাহর বিধান (দীন) পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।"–(সূরা আল আনফাল ঃ ৩৯)

কুরআন কারীমে বর্ণিত এসব আহ্বান আর নির্দেশ নবী মুহাম্মদ (স) এবং তার অনুসারীদের লক্ষ্য করেই আল্লাহ নাযিল করেন। যারা ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল এবং যারা হতে চাইছিল এবং চিরদুঃখী ঐসব বনী আদম দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করে যাদের কাছ থেকে হরণ করা হয়েছিল মানুষ হিসেবে বাঁচার অধিকার তাদের করুন আহাজারীতে আকাশ বাতাস মথিত হয়ে উঠেছিল। তারা বলে উঠছিলো—কোথায় আল্লাহর সাহায্য ? আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে!" অপরদিকে মক্কায় কুফরী শক্তি এবং মদীনার ইয়াহুদী ও মুনাফেক সম্প্রদায় আল্লাহর প্রেরিত দ্বীনকে দুনিয়া থেকে মুছে ফেলার জন্য হচ্ছিল

www.pathagar.com

ঐক্যবদ্ধ। অগ্নিপূজক পারস্য রাজ তো তার অধীনস্ত ইয়ামানী গভর্নরকে এই মর্মে ফরমান পাঠালো যে—তোমার অধীনস্ত ব্যক্তি যিনি হিজাজ এলাকায় নবুয়াতের দাবী করছে, গ্রেফতার করে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।"২৪

এসব অবশ্য অস্বাভাবিক কিছু ছিলো না, কারণ যে দীন আমীর ফকিরকে, শাসক আর শাসিতকে একই কাতারে নামতে বাধ্য করে, উৎখাত করে মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্বকে সে দীন তাদের নিকট পসন্দ হবে না এটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ অবস্থার অবসান চাইছিলেন। তারা মুখের ফুৎকারে আল্লাহর দ্বীনকে নিভিয়ে দিতে চাইলেও আল্লাহ তার দীনকে বিজয়ী করার জন্য ছিলেন ওয়াদাবদ্ধ। মানবতার বিজয়ের সেসব ইতিহাস পাঠক, পাঠিকাগণ পড়তে পারবেন কুরআন কারীমের তাফসীর আর রাসূল (স)-এর সীরাত গ্রন্থসমূহে।

দুঃখের বিষয়—ইসলামের এসব ইতিহাস আমাদের বাংলাদেশের মুসলিম সন্তানগণ তাদের বিদ্যালয়ে পড়তে পারে না বরং ইসলামের ইতিহাসের নামে তাদেরকে পড়ানো হয় মোঘল, ঘোরী, তুঘলক প্রমুখ রাজ বংশ আর রাজ-রাজাদের ইতিহাস, যে ইতিহাসের সাথে ইসলামী আদর্শ, উদ্দেশ্যের কোনো সম্পর্ক নেই। ফলশ্রুতিতে আমাদের দেশের শিক্ষালয়ে আবু বকর ইবনে কুহাফা, ওমার ইবনুল খাত্তাব, ওমার ইবন আবদুল আযীযের অনুসারী তৈরী হওয়ার বদলে তৈরী হয় ধর্মবিমুখ একদল সুবিধাবাদী রাজনীতিক আর ঘুষখোরের।

আল্লাহর পথে আহ্বানকারী

যেদিন থেকে আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (স)-এর উপর অহী নাযিল হওয়া শুরু হলো সেদিন থেকেই তার রাত্রি দিনের প্রতিটি মুহূর্ত এ চিন্তায় ব্যয় হতো যে, কিভাবে তিনি এ পথভোলা মানুষদেরকে আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আনবেন। মক্কার অলি-গলি, তায়েফের হৃদয় বিদারক ঘটনা ইত্যাদি প্রমাণ করে রাসূল (স)-এর মনে দাওয়াতী অনুভূতি তথা মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বানের প্রেরণা ও চেতনা কত তীব্র ছিল। অবাধ্য বান্দাদের উপর জাহান্নামের অসহনীয় ও ভয়াবহ শাস্তি রাসূলুল্লাহ (স)-কে দেখানো হয়েছিল এ কারণে তাদের পরিণতির কথা ভেবে তিনি সর্বদাই অন্তরে পেরেশানী বোধ করতেন। স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার এ পেরেশানীর চিত্র তুলে ধরেছেন এভাবে—

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلاَّ يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ○ (الشعراء : ٣)

২৪. সীরাতুন্নবী ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৪৬।

www.pathagar.com

"লোকগুলো আল্লাহর প্রতি ঈমান আনছে না—এ চিন্তায় হয়তোবা আপনি নিজেকে নিজে ধ্বংস করে ফেলবেন।"–(সূরা আশ শুআরা ঃ ৩)

فَذَكِّرْ قف اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌO لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍO (الغاشية : ٢١-٢٢)

"(হে নবী) আপনি শুধু উপদেশ দিতে থাকুন। আপনিতো শুধুমাত্র একজন উপদেশ দাতা, এদের উপর বলপ্রয়োগকারী নন।"

–(সূরা আল গাশিয়া ঃ ২১-২২)

অর্থাৎ আল্লাহ তার রাসূল (স)-কে এ মর্মে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন যে, হে নবী, আপনার কাজ হচ্ছে শুধু আপনার রবের দিকে মানুষকে আহ্বান করা। তারা যদি আপনার আহ্বানে সাড়া না দেয় তাহলে তো আপনার কিছুই করার নেই। আপনি তো আপনার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। সুতরাং যারা আপনার আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে না তাদের ব্যাপারটি আপনি আপনার রবের হাতেই ছেড়ে দিন।

আগুনে ঝাপ দিতে উদ্যত মানুষদেরকে তিনি কোমর ধরে ফিরাতে চাইছিলেন কিন্তু সেই মানুষগুলো উল্টো তারই কোমর ভেঙ্গে দেয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগছিলো। এরই একটি সুন্দর উপমা তিনি দিয়েছেন তার এক বাণীতে ঃ

"আমার দৃষ্টান্ত এরূপ, যেমন এক ব্যক্তি আগুনের কুণ্ডলী জ্বালাল। অতপর সেই আগুনের ঔজ্জল্যে পোকামাকড়গুলো আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো। কিন্তু সেই ব্যক্তিটি তো সেগুলোকে বাধা দিচ্ছে, আগুনে ঝাপ দেয়া থেকে ফিরাতে চেষ্টা করছে। কিন্তু পোকা মাকড়গুলো তার এ চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে তার উপর জয়ী হওয়ার চেষ্টা করছে আর দলে দলে আগুনে লাফিয়ে পড়ছে। ঠিক সেই রকমই আমি তোমাদের কোমর ধরে আগুনে পড়া থেকে ফিরাবার চেষ্টা করছি। অথচ তোমরা কেবল সেই অগ্নিকুণ্ডলীতেই ঝাপিয়ে পড়ছো অবিরতভাবে।"–(বুখারী, মুসলিম)

আল্লাহর স্মরণ

বিশ্ব নবী মুহাম্মদ (স) নেতৃত্বের ক্ষেত্রে যেমন ছিলেন আদর্শ নেতা, সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে যেমন ছিলেন আদর্শ সংস্কারক, যুদ্ধের ময়দানে যেমন ছিলেন আদর্শ সেনাপতি, দুস্ত, ইয়াতীমদের জন্য ছিলেন যেমন আদর্শ অভিভাবক ও পিতা, স্ত্রীদের নিকট যেমন আদর্শ স্বামী, ঠিক তেমনি আল্লাহকে স্মরণ ও ভয় করার বেলায়ও তিনি ছিলেন সবার চেয়ে অগ্রগামী।

www.pathagar.com

বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (স) রাতে একাকী নফল নামায আদায় করার বেলায় এত অধিক সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, তার পা ফুলে যেত। এসব দেখে কোনো কোনো সাহাবী আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! আল্লাহ তো আপনার আগের পিছের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন কিন্তু তা সত্বেও কেন আপনি এত কঠোর সাধনা করছেন ? জবাবে রাসূল (স) বললেন—আমি কি আল্লাহর শোকর গোজার বান্দাহ হবো না ?

রাসূলুল্লাহ (স) আরও বলতেন—নামায আমার চক্ষু শীতলকারী।-(বুখারী) একদিন আবু বকর (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে উদ্দেশ করে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনার চুল পাকতে শুরু করেছে। রাসূল (স) জবাব দিলেন—আমাকে সূরা হুদ, ওয়াকিয়া, মুরসালাত ও সূরা নাবা বৃদ্ধ করে দিয়েছে।-(তিরমিযী)। উল্লেখ্য, এসব সূরায় কিয়ামাত ও আখিরাতের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (স) বলতেন, হে লোক সকল আমি যা জানি, তা যদি তোমরা জানতে তাহলে তোমাদের হাসি কম হতো এবং কান্না বেশী হতো।"-(বুখারী, মুসলিম)

নবী মুহাম্মদ (স)-এর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান

আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (স) বৈজ্ঞানিক হিসেবে এ ধরায় আসেননি। বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া তার কাজও ছিলো না। কিন্তু তথাপিও তার শিক্ষক যেহেতু ছিলেন মহাবৈজ্ঞানিক আল্লাহ সে কারণে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুখ থেকে কখনো কখনো এমন সব তথ্য আর উপদেশ বাণী বের হতো যা আজকের বিজ্ঞানীদের জন্য পথনির্দেশের কাজ করছে। যেমন উদাহরণ স্বরূপ সূর্যগ্রহণের কথাই ধরা যাক। যে যুগে মুহাম্মদ (স) জন্মেছিলেন সে যুগে সূর্যগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণ নিয়ে মানুষের মাঝে যে সমস্ত কাহিনী আর কল্প কথা বিরাজমান ছিল তা শুনলে না হেসে পারা যায় না। অথচ রাসূল (স) বলতেন এসবের সম্পূর্ণ বিপরীত। রাসূলুল্লাহ (স)-এর এক পুত্র ইবরাহীম যেদিন মারা যান ঘটনাক্রমে সেদিন সূর্যগ্রহণ হয়। সকলে বলাবলি করতে লাগলো রাসূলুল্লাহ (স)-এর ছেলে মারা গেছে বলেই আজ আকাশ শোকাবিভূত হয়ে পড়েছে এবং পৃথিবী জুড়ে অন্ধকার নেমে এসেছে। এ সংবাদ শ্রবণ করে রাসূল (স) সবাইকে ডাকলেন এবং বললেন, সূর্যগ্রহণ আর চন্দ্রগ্রহণ হচ্ছে আল্লাহর নিদর্শন (অর্থাৎ সৃষ্টিকর্মের ও বিশ্ব পরিচালনার প্রয়োজনেই এ রকম হয়)। কারোর জীবন মরণের সাথে এর কোনোই যোগাযোগ বা সম্পর্ক নেই।-(আবু দাউদ বায়হাকী)

www.pathagar.com

মুহাম্মদ (স) যদি ভণ্ড (নাউযুবিল্লাহ) হতেন তাহলে জাতির এহেন সরল বিশ্বাস আর শ্রদ্ধাকে কাজে লাগিয়ে দুনিয়ার আয়েশ লুঠতে পারতেন যেমনটা আজকালের ভণ্ড পীরেরা করে থাকে। কিংবা মানবসুলভ স্বভাব বশত বড়ত্ব দেখিয়ে তিনি এমনও বলতে পারতেন যে, হ্যাঁ, এটা আমার সন্তানের মৃত্যুর কারণেই হয়েছে।

কিন্তু না, তিনি এমন বাক্য উচ্চারণ করলেন যা শুধু তার বিনয়কেই প্রকাশ করলো না, জানিয়ে দিলো এমন এক তথ্য যা বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করতে কাঠ-খড় পুড়িয়েছে এক হাজার বছর।

অতপর মাছি সম্পর্কিত হাদীস। যেখানে রাসূল (স) বলেছেন যে, মাছির এক ডানায় রয়েছে বিষ আর অপর ডানায় রয়েছে সে বিষের প্রতিশেধক। অথচ এ তথ্য আবিষ্কার হয়েছে এই মাত্র কয়েক বছর আগে।

এমনিভাবে খাদ্য গ্রহণের সময় পেটের এক ভাগ খালি রাখা সম্পর্কিত হাদীসও উল্লেখযোগ্য। এ হাদীস শুনে জনৈক আমেরিকান ডাক্তার সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। ঘটনাটি ছিল এই—

এ ডাক্তার (আমেরিকার এক ইউনিভার্সিটিতে)"খাদ্য গ্রহণ ও পাচক রস নিঃস্বরণ" সম্পর্কিত বিষয়ে ক্লাস নিচ্ছিলেন এবং খাবার সময়ে পেটের এক ভাগ খালি রাখা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য উত্তম এ ব্যাপারে ছাত্রদের উপদেশ দিচ্ছিলেন। উপদেশ শুনে জনৈক সুদানী ছাত্র বলে বসলেন—"একথা তো আমরা মুসলিমরা অনেক আগেই জানি।" ডাক্তার সুধালেন কিভাবে ?

সুদানী ছাত্রটি জবাব দিলেন আমাদের নবী, যিনি আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে এ পৃথিবীতে এসেছিলেন বলে গেছেন খাবার সময় পেটকে কানায় কানায় পূর্ণ করে খেয়ো না বরং হজমের সুবিধার জন্য পেটের এক ভাগ খালি রেখো।

ডাক্তার শুনে বিস্মিত হলেন, আর বললেন যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চিতভাবেই তিনি আল্লাহর মেসেঞ্জার ছিলেন, যে আল্লাহ মূসা এবং ঈসাকে পাঠিয়েছেন।

প্রিয় পাঠক, "কেমন ছিলেন এ কুরআনের বাহক" এ অধ্যায়ের এবার আমি সমাপ্তি টানতে চাই। তবে এর পূর্বে কেন আমি আমার এ বইয়ে মহানবী (স)-এর জীবনেতিহাস আলোচনা করার চেষ্টা করলাম তা বর্ণনা করতে চাই। আমি বুঝাতে চেয়েছি যে, এ সমস্ত গুণরাজীর অধিকারী কোনো

www.pathagar.com

সাধারণ মানুষ হতে পারে না। একজন রক্ত মাংসের মানুষ কখনোই জীবনের সর্বদিক দিয়ে এরূপ ত্রুটিহীন হতে পারেন না, যদি না তার নিকট স্বর্গীয় কোনো GUIDENCE প্রেরিত হয়।

আমরা দেখি মানব শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর সে কথা বলতে পারে না, নিজের চেষ্টায় বসবে দূরে থাক জন্মের পর ২/৩ সপ্তাহ অবধি নিজের চেষ্টায় সে এক দিকে কাতও হতে পারে না, ক্ষুধা লাগলে এক ধরনের দুর্বোধ্য চিৎকার ছাড়া কিছুই তার মুখ থেকে বের হয় না। অতপর সে ধীরে ধীরে মা-বাবার নিকট থেকে কথা বলতে শিখে। মা, বাবা যে ভাষায় কথা বলে সেটাই হয় তার ভাষা। উদাহরণ স্বরূপ, কোনো আরবী ভাষীর সন্তান যদি ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে একজন বাংলাভাষীর ঘরে লালিত পালিত হয় তাহলে সে বাংলা ভাষায় কথা বলতে শিখবে পক্ষান্তরে কোনো বাংলা ভাষীর সন্তান যদি কোনো আরবী ভাষীর ঘরে লালিত পালিত হয় তাহলে সে আরবী ভাষায় কথা বলা শিখবে। অথবা তাকে যদি শৈশব থেকেই কোনো জংগলে ছাগল ভেড়া আর বনের পাখীদের মাঝে বড় করা হয় তাহলে দেখা যাবে মানুষের মত কথা বলতে সে অক্ষম। এ হচ্ছে বাস্তব কথা এবং শিক্ষার ফল। যা হোক, অতপর তাকে যে ধরনের শিক্ষা দেয়া হয় সে ঐ রকমই গড়ে উঠে। উদাহরণ স্বরূপ, আমাদের দেশের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাদ্রাসা শিক্ষার কথা ধরা যেতে পারে। যারা মাদ্রাসা পাশ করে বের হয় তারা দু' চোখে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদেরকে দেখতে পারে না ------ অনুরূপভাবে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ করা ছাত্রগণ মাদ্রাসা ছাত্রদেরকে হীনজ্ঞান করে। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা শ্রেণীর মধ্যে আবার দু' ধরনের লোক দেখা যায়। একদল হচ্ছে ধর্মভীরু ইসলামী আদর্শের প্রতি অনুরাগী ও নিষ্ঠাবান, অপর দল হচ্ছে প্রচণ্ড রকম ধর্ম বিদ্বেষী কিংবা সুবিধাবাদী। এ দু' দলের অতীত ইতিহাস অর্থাৎ শিক্ষাজীবন অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে প্রথম দলের সম্পর্ক ইসলামী বইপত্র এবং কুরআন হাদীসের সাথে এবং দ্বিতীয় দলের সম্পর্ক এমন সব সাহিত্যের সাথে যেসব সাহিত্যে ধর্মকে পরিহাস করা হয়েছে, দেখানো হয়েছে—ধর্ম মানুষের সৃষ্টি, শোষনের হাতিয়ার।

এক্ষণে, উপরোক্ত এ লম্বা ভূমিকার পর আমার প্রশ্ন হচ্ছে—মূর্খতা, অজ্ঞতা আর বর্বরতা পরিবেষ্টিত এক সমাজে লালিত পালিত মুহাম্মদ (স) কোন্ শিক্ষার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন ? কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে বা কাদের প্রভাবে তিনি এমন অতুলনীয় গুণরাজীর অধিকারী হয়ে গেলেন ? সুতরাং এসবে কি প্রমাণিত হয় না যে, তিনি আল্লাহর নবী ছিলেন এবং তার শিক্ষক ছিলেন স্বয়ং আল্লাহ।

www.pathagar.com

শেষ কথা

আল কুরআনুল কারীম আমানত। আল্লাহ এ আমানতের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে দৃষ্টান্ত পেশ করে বলেছেন–

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ط وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ○ (الحشر : ٢١)

"হে আদম সন্তানগণ, এ কুরআনকে যদি আমি পাহাড়ের মত কঠিন ও চেতনাহীন জিনিসের উপরও নাযিল করতাম তাহলে তোমরা দেখতে যে, সে পাহাড় আল্লাহর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে। ---- এসব দৃষ্টান্ত আমি তোমাদের জন্য বর্ণনা করি যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা কর।"

–(সূরা হাশর ঃ ২১)

অতীতের জাতিগুলোর নিকটও এমনি ধরনের আমানত আল্লাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের অধিকাংশই সে আমানতকে রক্ষা করেনি। ফলে দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জগতের ক্ষতিতেই তারা নিমজ্জিত হয়েছে। নিসন্দেহে এই ছিল তাদের প্রাপ্য। বস্তুত, আমানতের হক বুঝেও যে খিয়ানত করতেই থাকে তার ধ্বংস কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। ঠেকানো আল্লাহর নীতিও নয়।

সুতরাং ------ প্রিয় পাঠক, আপনার যদি দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যে, এ কুরআন আল্লাহ নাযিল করেছেন, এবং এও যদি বুঝতে সক্ষম হন যে—আপনার-আমার জীবন যাপনের বিধান হিসেবেই আল্লাহ তা পাঠিয়েছেন তাহলে আপনার কর্তব্য হবে এখন থেকেই আপনার পথ বেছে নেয়া—কোন্ পথে আপনি চলবেন।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১

বিক্রয় কেন্দ্র

৪৩৫/২-এ, বড় মগবাজার,
(ওয়ারলেস রেলগেট)
ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৩৯৪৪২

○

১০, আদর্শ পুস্তক বিপণী
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।

www.pathagar.com